Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশে খ্রীষ্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শাবরিনা আক্তার নিপা

রোলঃ 228020958

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশে খ্রীষ্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শাবরিনা আক্তার নিপা

রোলঃ 228020958

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " বাংলাদেশে খ্রীষ্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শাবরিনা আক্তার নিপা, আইডিঃ 228020958 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বাংলাদেশে খ্রীষ্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

শাবরিনা আক্তার

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

শাবরিনা আক্তার নিপা

আইডিঃ 228020958

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

২০২৫ সাল পর্যন্ত খৃষ্টানদের বিভিন্ন টার্গেট ও পরিকল্পনা 0

বাংলাদেশে মিশনারির আগমন 3

Board of Directors এর প্রস্তাব 5

যে সমস্ত এনজিও সেবার নামে সরাসরি ধর্ম প্রচার করছে 5

মুসলমানের সন্তান নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে চিনে না, মেরী ও যীশুকে চিনে ! 7

মিশনারির স্বরূপ সন্ধানে 8

মিশনারি শ্রেণীবিভাগ 9

বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক 9

প্রতিষ্ঠান ও প্রচার মাধ্যম 9

প্রকাশনা 11

প্রকাশনায় অপকৌশল 11

মুসলিম ঐতিহ্যবাহী নকশা নকল 12

ইসলামী পরিভাষা ও নামাবলী ব্যবহার 12

বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম জালিয়াতি 13

পবিত্র কুরআনের অপব্যাখ্যা 13

এলাকা ও জনগণ নির্ধারণ 14

প্রচার ও প্রচারণার অপকৌশল 15

সাঁওতাল ভাইদের কি খবর ? 16

একটি পরিসংখ্যান 20

কি হচ্ছে দিনাজপুর ও পঞ্চগড়ে ? 21

খৃষ্টানদের চ্যালেঞ্জ 23

মসজিদের খতীব খৃষ্টান 25

ঝিনাইদহে মুরতাদদের সাথে একদিন.....25
মুসলমানদের গ্রামে খৃষ্টানদের চার্চ.....26
মাদারগঞ্জে কয়েক হাজার খৃষ্টান.....27
খৃষ্টান প্রচারকের সাথে বিতর্ক ও দাওয়াত.....27
লাদেশে খৃষ্টানদের ৬ টি ধর্মপ্রদেশ.....30
নীলফামারীতে মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার চাঞ্চল্যকর তথ্য.....30
৫ হাজার টাকার বিনিময়ে ৫৫ মুসলমানকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা.....31
খৃষ্টধর্ম প্রচারকদের কয়েকজন.....33
সেবা দিয়ে তাদের টার্গেট কি ?.....34
মিশনারি স্কুলের মাধ্যমে তাদের টার্গেট.....34
নীলফামারী জেলায় খৃষ্টধর্ম প্রচার.....36
নেত্রকোনা জেলায় ধর্মপ্রচার.....36
মি. বুশের একটি ভাষণ.....37
চট্টগ্রামে খৃষ্টানদের দাওয়াতি কাজ.....37
জুমল্যান্ড পরিকল্পনা.....38
স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মাধ্যমে ধর্মান্তরকরণ.....39
খৃষ্টান বানানোর কৌশল.....39
মিশনারি কর্মীদের নির্লজ্জ কাহিনী.....43
দাওয়াতি কার্যক্রম.....44
সূত্রঃ.....45

لَـقَدۡ كَفَرَ الَّذِيۡنَ قَالُوۡۤا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنۡ اِلٰهٍ اِلَّاۤ اِلٰـهٌ وَّاحِدٌ ‌ؕ وَاِنۡ لَّمۡ يَنۡتَهُوۡا عَمَّا يَقُوۡلُوۡنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا مِنۡهُمۡ عَذَابٌ اَ لِيۡمٌ ٧٣

তারা অবশ্যই কুফরী করেছে যারা বলে আল্লাহ তিন জনের মধ্যে একজন, কারণ এক ইলাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার ইলাহ নেই। তারা যা বলছে তা থেকে তারা যদি নিবৃত্ত না হয়, তাহলে তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব গ্রাস করবেই।(আল মা'ইদাহ : ৭৩)

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন আল্লাহ বলেন, " মানুষ আমাকে গালি দেয়, অথচ তা তাদের জন্য উচিত নয়। আর গালি দেয়ার অর্থ হলো, তারা বলে যে, আমার পুত্র আছে। অথচ স্ত্রী বা সন্তান গ্রহণ করা থেকে আমি পবিত্র। (সহীহ্ বুখারী: ৪৪৮২)

২০২৫ সাল পর্যন্ত খৃষ্টানদের বিভিন্ন টার্গেট ও পরিকল্পনা

১৯৭৮ সালে উত্তর আমেরিকার লুওয়াজিন নামক স্থানে সমকালীন খৃষ্টবাদ প্রচারের ধারাবাহিকতায় এক ঐতিহাসিক কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। তাতে সারা দুনিয়ার প্রায় দেড়শ প্রথম সারির খৃষ্টান ধর্মগুরু ও ধর্মনেতাগণ যোগদান করেন। তাদের প্রত্যেকেই বিভিন্ন দেশের বড় বড় গির্জা, মিশনারি প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি ছিলেন। উক্ত কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী সবাই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা, জ্ঞান-গবেষণা এবং বোধ ও বুদ্ধিমত্তার আলোকে বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে মুসলমানদের মাঝে খৃষ্টবাদ প্রচারের স্বার্থে এ ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেন যে, দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার সময় যদি তাৎক্ষণিকভাবে মুসলমানদেরকে খৃষ্টবাদের বিষাক্ত ট্যাবলেট গলধকরণ করানো নাও যায় তাহলে সমস্যা নেই; কিন্তু কমপক্ষে অতি অবশ্যই মুসলমানদের মাঝে নৈতিক ও চারিত্রিক স্খলন ঘটানো এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাদেরকে পঙ্গু করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যেতে হবে। কনফারেন্সে যোগদানকারী ধর্মনেতাগণ এ প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে একটি রিসার্চ ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার দাবী জানান। যা পরবর্তীতে একজন প্রসিদ্ধ উগ্র ও চরমপন্থী খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক স্যামুয়েল জেইমারের নামে পরিচিতি লাভ করে।

মোটকথা, গির্জাপতি আর ধর্মনেতাগণ খৃষ্টধর্ম প্রচার-প্রসারের পথকে সহজ ও সুগম করতে কোন কল্পনা-পরিকল্পনা বাকি রাখেননি। একজন মুসলমানের অমূল্য সম্পদ ঈমানকে ছিনতাই করা, মুসলিম যুবসমাজের চরিত্রকে নষ্ট করা এবং ইসলামবৃক্ষের গোড়াকর্তন করার – সার্বিক অর্থেই যতো পথ ও পন্থা হতে পারে তারা সব আবিস্কার করেছে এবং মুসলমানদেরকে সে

অনুযায়ী পরিচালিত করছে। কিন্তু পরিতাপের কথা হলো, মুসলমানরা নিজেদের সঠিক পথ ছেড়ে ইয়াহুদি-খৃষ্টানদের বাতলানো পথে চলতে লজ্জা ও অনুশোচনাবোধ তো দূরের কথা, বরং সেটাকেই গর্ব ও আভিজাত্যের বিষয় মনে করছে। যারা এ ব্যাপারে সামান্য "নাক গলায়", তাদেরকে সেকেলে, চরমপন্থী, প্রগতির পথে বাধা ইত্যাদি নানা বিশেষণে বিশেষায়িত করছে।

আপনাদের সামনে একটা রিপোর্ট পেশ করছি,আশা করছি এর দ্বারা আপনারা খৃষ্টানদের বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করতে পারবেন।

আন্তর্জাতিক খৃষ্টান মিশনারি প্রতিষ্ঠান তার তেরতম বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশ করে। তাতে রয়েছে খৃষ্টান মিশনারিদের অতীত সফলতাসহ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া। চলতি শতাব্দীর প্রথম ২৫ বছরে তাদের কি কি অভিসন্ধি রয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নে কোন পথে এগুতে হবে, কি পরিমাণ অর্থসম্পদ তাতে ব্যয় হবে, কতজন ধর্মপ্রচারক ও মিশনারি এই মিশনে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তার সম্ভাব্য ফলাফল কি দাঁড়াতে পারে ইত্যাদি বিষয়ের সামান্য চিত্র তাতে তুলে ধরা হয়েছে। আমেরিকার অরজিনা ভার্সিটির খৃষ্টান প্রফেসর ডক্টর ডিওড বেরিয়েট এ প্রতিবেদনের উপর বিস্তর গবেষণা-পর্যালোচনা করার পর মন্তব্য করেছেন –

"নিশ্চয়ই এই প্রতিবেদন দুনিয়াজুড়ে খৃষ্টানদের একচ্ছত্র আধিপত্যের ইঙ্গিত বহন করছে। এ আধিপত্য সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনেও হতে পারে, আবার হতে পারে চিন্তানৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক অঙ্গনে। খৃষ্টানদের কর্মতৎপরতা ও সফলতার একটি চিত্র দেখুন – শুধুমাত্র ১৯৯৬ সালের এক বছর সময়েই খৃষ্টানরা সারা দুনিয়ায় বাইবেলের ২৮ বিলিয়ন কপি (আঠারশত কোটি কপি) বিতরণ করেছে। আর এ কথা শুনলে তো রীতিমত অবাক হতে হয় যে, গেলো বছর পর্যন্ত পৃথিবীর নামী-দামী বড় বড় লাইব্রেরীগুলোতে যীশু খৃষ্টের নামে লেখা বই-পত্রের সংখ্যা ৬৫৭৫১ এ দাঁড়িয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৫৩০৯৪ টি বইয়ের প্রচ্ছদে উজ্জ্বল ও স্পষ্ট অক্ষরে যীশু খৃষ্টের নাম লেখা আছে।"

ডক্টর বেরিয়েট আরো বলেন, উক্ত প্রতিবেদনে সে সকল অঞ্চলের আলোচনাও এসেছে যেগুলোতে এখনো পর্যন্ত খৃষ্টধর্মের দাওয়াত পৌঁছেনি। উক্ত প্রতিবেদনে অ-খৃষ্টান রাজ্যসমূহকে 'আলিফ' ও 'বা' – এই দুটো শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে।

“আলিফ’ দ্বারা উদ্দেশ্য সে সকল রাজ্য, যেগুলোতে খৃষ্টধর্মের আওয়াজ বিলকুল পৌঁছেনি। আর ‘বা’ দ্বারা সে সকল রাজ্য উদ্দেশ্য, যেগুলো খৃষ্টান রাজ্যের পার্শ্ববর্তী ও ভৌগলিক দিক থেকে তার সাথে মিলিত। উক্ত প্রতিবেদনে দাবী করা হয় যে, অ-খৃষ্টান রাজ্যসমূহে অনতিবিলম্বে খৃষ্টধর্মের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভৌগলিক তথ্য, ভাষা ও আঞ্চলিক সব রীতি অভ্যাস সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ইতিমধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে।

উক্ত প্রতিবেদনের একটি পরিসংখ্যান ছিল এই যে, বর্তমানে অ-খৃষ্টান রাজ্যে বসবাসকারী জনগণের সংখ্যা হলো তের বিলিয়ন। আর এই জনপদগুলোতে বছরে প্রায় ৪৭ মিলিয়ন লোক বাড়ছে। এ হিসেবে দৈনিক ১২৯০০০ নবজাতক শিশু জন্মগ্রহণ করছে। উনিশ শতকে জনসংখ্যার বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র এক মিলিয়ন। এ হিসেবে আশা করা যায়, বিশ শতকে অ-খৃষ্টানদের রাজ্যের জনসংখ্যা ১৪ বিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে ১৫ বিলিয়নে পৌঁছে যাবে। (এডিটেডঃ হিসাবে কোন একটা প্রবলেম হয়েছে, তবে এটা শিউর যে, “বিলিয়ন” হবে না। হতে পারে মিলিয়নের পরিবর্তে ভুল করে বিলিয়ন লেখা হয়েছে, কিন্তু শিউর না হয়ে কারেক্ট করতে পারছি না।)

পৃথিবীর শতকরা ৮১ ভাগ লোক কোন না কোন ধর্ম পালন করে। এ হিসেবে পৃথিবীতে বর্তমানে নাস্তিক বা স্রস্টায় অবিশ্বাসী লোকের সংখ্যা হলো ১১১০ মিলিয়ন। সারা পৃথিবীতে ১৫ হাজারেরও বেশী ধর্মের প্রচলন রয়েছে। আর দিন দিন তো নতুন ধর্মের সংখ্যা বেড়েই চলছে। এই বৃদ্ধি খৃষ্টানদের ধর্ম প্রচারে বড় বাঁধা। এখন আমরা বাংলাদেশে খৃষ্টান মিশনারীদের কর্মফলাফল, গির্জার সফলতা ও অন্যান্য সংস্থার কারগুজারী ধারাবাহিক উল্লেখ করবো ইন শা আল্লাহ। যা দ্বারা অনুমান করা সহজ হবে যে, বাংলাদেশে তাদের অপতৎপরতা কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশে মিশনারির আগমন

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ١١١

তারা বলে, ইয়াহূদী এবং নাসারাগণ ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, ওটা তাদের আকাঙ্ক্ষা মাত্র। বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে নিজেদের দলীল পেশ কর'। (আল-বাকারাহ:১১১)

মিশনারি হলো খৃষ্টানদের দাওয়াতি সংস্থা। সারা দুনিয়াতে কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে লক্ষ্ লক্ষ প্রচারকের মাধ্যমে খৃষ্টানরা খৃষ্টধর্মের দাওয়াত দিয়ে আসছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে, আজ থেকে পাঁচশ বা ছয়শ বছর আগে খৃষ্টান মিশনারিরা এই বাংলায় আসে। পর্তুগিজরা যখন বাংলায় বা ভারতে আসে তখন সাথে করে খৃষ্টান মিশনারিদেরও নিয়ে আসে। জেসুইস ও অগস্টেইনিয়া নামক ক্যাথলিক খৃষ্টানদের দুটো দল পর্তুগিজ ব্যবসায়ীদের ছত্রছায়ায় ২০০ বছর যাবত বাংলায় খৃষ্টধর্ম প্রচার করে আসছে। মোগল সম্রাট আকবর ভারতের বাঙাল প্রদেশের প্রসিদ্ধ স্থান হুগলিতে পর্তুগিজদের বসতি স্থাপনের অনুমতি দিলে তাদের ছত্রছায়ায় মিশনারিরা এসে এলাকায় গির্জা প্রতিষ্ঠা করলো, স্কুল বানালো, হাসপাতাল চালু করলো। হুগলিকে কেন্দ্র করে খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে তারা ঢাকাতেও নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করলো।

এভাবে ১৬২১ খৃষ্টাব্দে এতদাঞ্চলে খৃষ্টান মিশনারি তৎপরতা পূর্ণ উদ্যমে শুরু হয়। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান ৭৭৭ বিঘা জমি বিনা খাজনায় (লা-খেরাজ) খৃষ্টান মিশনারিদের দান করলেন। ফলে তারা আরো বেশী উৎসাহিত হয়। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, মোঘল আমলে খৃষ্টান মিশনারিরা অগস্টেইনিয়া গির্জা গড়ে তোলে। (আমাদের মধ্যে যেমন বিভিন্ন দল-উপদল আছে, তেমন খৃষ্টানদের মধ্যে বিভিন্ন দল আছে, যেমন – জেসুইল, অগস্টেইনিয়া, ক্যাথলিক, ব্যাপটিস্ট, প্রটেস্ট্যান্ট ইত্যাদি) মোগল আমলে মোগল বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে বাংলায় ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দের পরে ১৩ টি অগস্টেইনিয়া গির্জা গড়ে উঠে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে রোমান ক্যাথলিকদের সংখ্যা বেশী। ব্যাপটিস্টদের সংখ্যাও কম নয়।

১৯০৮ সালে ব্রিটিশ আমলে চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনায় ব্যাপটিস্টরা এসে একটি সোসাইটি হাসপাতাল গড়ে তোলে। লেবৃসি হসপিটাল কুষ্ঠনিরাময় কেন্দ্র খোলে। বাংলাদেশে মোট খৃষ্টান সংখ্যা ৫ লাখ, এর মধ্যে ব্যাপটিস্ট খৃষ্টানদের সংখ্যা বর্তমানে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন ছলে বলে কৌশলে পুরো ভারতের ক্ষমতা হাতে নিলো, তখন মূলত

আনুষ্ঠানিকভাবে খৃষ্টান মিশনারিদের তৎপরতা চালু হয়। পর্যায়ক্রমে পাকিস্তান আমলে এবং পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশে খৃষ্টান মিশনারিদের তৎপরতা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখি, খৃষ্টানরা যেখানেই গেছে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে আর সমাজের বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা-উপকরণ সরবরাহ করেছে। হাসপাতাল স্থাপন, ঋণসুবিধা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং দরিদ্রতা বিমোচনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। নারীদের ক্ষমতায়ন তাদের অন্যতম শ্লোগান আজ। তবে খৃষ্টধর্ম প্রচারই তাদের মূল লক্ষ্য। যা সেবার ছলনায় শুরু থেকেই তারা বাস্তবায়ন করে আসছে।

১৮৫৭ সালে আযাদী আন্দোলনের পর এই উপমহাদেশে ৯০ টি প্রটেস্ট্যান্ট খৃষ্টান মিশনারি কর্মরত ছিল। তারা এদেশে জটিল রোগের চিকিৎসার জন্যে বড় বড় ডাক্তার, সার্জনদের ইংল্যান্ড থেকে নিয়ে আসে এবং চট্টগ্রাম, কক্সবাজারের মালুমা ঘাট, ময়মনসিংহ, রংপুর, রাজশাহীসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে হাসপাতাল তৈরি করে বিনা পয়সায় চিকিৎসা সেবা দেয়। এর আড়ালে সমতল ভূমি ও পার্বত্য এলাকায় খৃষ্টধর্ম প্রচার পুরোপুরি অব্যাহত রাখে।

৭১ এ স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে ৩০,০০০ এনজিও কাজ করে যাচ্ছে। এই এনজিওরা কোটি কোটি টাকা খরচ করে। প্রশ্ন জাগে, এই টাকা দেয় কারা ? তাদের তো টাকশাল নেই, তারা টাকা বানায় না। বিশ্বের বড় বড় ধনকুবেররা ইয়াহুদি ও খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী। আর কোন ধনকুবের বরং সাধারণ সম্পদশালীও তার অর্থ বেকার খরচ করে না। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, মুসলমানদের খৃষ্টান বানানোর জন্য তারা কোটি কোটি টাকা খৃষ্টান মিশনারিতে দেয়।

Board of Directors এর প্রস্তাব

আযাদী আন্দোলনের পর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টানদের Board of Directors গৃহীত প্রস্তাবে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তাতে খোলাখুলি বলা হয়েছে যে, "প্রকৃতি ভারতীয় উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলটি এই জন্যে ব্রিটেনের কাছে সোপর্দ করে, যাতে এতদঅঞ্চলের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মিশনারিদের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়। তাই এতদঞ্চলকে খৃষ্টান রাষ্ট্রে পরিণত করার আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিৎ।" (সূত্রঃ তারিখে পাকিস্তান)

বর্তমানে এটাই বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চলছে।

যে সমস্ত এনজিও সেবার নামে সরাসরি ধর্ম প্রচার করছে

অসহায়, নিরক্ষর মানুষকে সেবা দেওয়ার নামে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে যে সংস্থাগুলো উল্লেখযোগ্য তৎপরতা চালাচ্ছে তার মধ্যে কিছু হলো –

(১) কারিতাস, (২) এন.সি.সি. (ননলাইট সেন্ট্রাল কমিটি), (৩) লুথারান মিশন, (৪) দ্বীপশিখা, (৫) সালভেশন আর্মি, (৬) ওয়ার্ল্ড ভিশন, (৭) সি.ডি.এস. (সেন্ট্রাল ফর ডেভেলপম্যান্ট সার্ভিস), (৮) আর.ডি.আর.এস. (রংপুর দিনাজপুর রোড এন্ড সার্কেল), (৯) সি.সি.ডি.ভি. (খৃষ্টান কমিশন অফ ডেভেলপম্যান্ট), (১০) হিড বাংলাদেশ, (১১) সেভেন ডে এডভেঞ্চারিস্ট, (১২) চার্চ অফ বাংলাদেশ, (১৩) পের ইন্টারন্যাশনাল, (১৪) সুইডিশ ফ্রেমিশন, (১৫) কনসার্ন, (১৬) এডরা, (১৭) অস্ট্রেলিয়ান ব্যাপটিস্ট সোসাইটি, (১৮) এমসিনি, (১৯) ওয়াই.ডব্লিউ.সি. (২০) ফেমিলিজ ফর চিলড্রেন, (২১) আল-হানিফ কল্যাণ ট্রাস্ট ইত্যাদি।

এসব সংস্থা বাজেটের ৯০ ভাগ খৃষ্টানদের অথবা খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনায়ময় ব্যক্তিদের পিছনে ব্যয় করে থাকে।

এনজিওদের কার্যক্রম

চার্চ অফ বাংলাদেশ

ডঃ জিগা বি. আলসেনের পরিচালনায় "চার্চ অফ বাংলাদেশ" নামে একটি খৃষ্টান মিশনারি এনজিও "মৌলবাদী এনজিও", ১৯৬৫ সালে কক্সবাজারের মালুমঘাটে "মেমোরিয়াল হসপিটাল" নামে একটি খৃষ্টান হাসপাতাল তৈরি করে। এলাকার লোকজন ছিল অভাবগ্রস্ত ও নিরক্ষর। এই সুযোগে ড. ভিগা বি আলসেন তার প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে সেবাদানের মাধ্যমে ৩৮ বছর এই মালুমঘাটের চকরিয়ায় খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে থাকেন। ১৯৬৪ সালে মালুমঘাটে যেখানে একজনও খৃষ্টান ছিল না, তার প্রচেষ্টায় ২০০৩ সালে সেখানে খৃষ্টানদের সংখ্যা ৪০ হাজারে উন্নীত হয়েছে। তারা আশেপাশের জমি ক্রয় করে নয়া খৃষ্টানদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে। অন্যদিকে চট্টগ্রামের দৌলতপুরে মরিয়াম আশ্রমের পাশে তারা বিশাল খৃষ্টান এলাকা গড়ে তুলেছে। সেখানে দুর্গম এলাকায় পাহাড়ের ভিতরে তারা গির্জা নির্মাণ করেছে।

সেভেন ডে এডভেঞ্চারিস্ট

-

এই "সেভেন ডে এডভেঞ্চারিস্ট" খৃষ্টান মিশনারি তাদের সহযোগীদের মাধ্যমে ৮৫ টি প্রাইমারী স্কুল, মাধ্যমিক স্কুল পরিচালনা করে। এসব স্কুলে কোন মুসলমানের সন্তান ভর্তি নেওয়া হয় না। ১৯৯০-৯১ সনে এই "সেভেন ডে চার্চ" ২৩০ মিলিয়ন টাকা খরচ করে বহু মানুষকে খৃষ্টান বানিয়েছে।

হিড বাংলাদেশ

"হিড বাংলাদেশ" নামে এ এনজিও মৌলভী বাজারে, কমলগঞ্জে, সুন্দরবনে সেবার আড়ালে খৃষ্টধর্ম প্রচার করে যাচ্ছে। সূচনাতেই তারা ৬ লক্ষ মার্কিন ডলার নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে।

সি. সি. ডি. ভি.

"সি. সি. ডি. ভি." নামক সংস্থা রংপুর, দিনাজপুরসহ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে কাজ করছে। আর "ডি.আর. আর. এস." এর সমস্ত সংগঠন টাকা নেয় সুইডেন, ডেনমার্ক, ইংল্যান্ড থেকে। টাকা আনে মিস্টার টরবেন পিটারসের নেতৃত্বে ১৯৮৬ সালে ২১৮ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বৃহত্তর দিনাজপুর, রংপুর অঞ্চলে সাঁওতাল উপজাতিদেরকে দাওয়াত দিয়ে ৩৫ হাজার সাঁওতালকে তারা খৃষ্টান বানিয়েছে।

পাহাড়িদের বিভিন্ন উপজাতি

এগুর্ণা, চাকমা, মারমা, তনচৈঙ্গা, চাক, ক্ষুমি, ভৌম, ত্রিপুরা, খাশিয়া, মনিপুরী, খিয়াং, মাংখু, লুশাই, মগ, গারো, মুরু, সাঁওতাল, রাখাইন, হাজং, রাজবংশী, মুরং, কুকি, হুদি, পাংখো, উড়াও, বোনজোগী, দালই, লুসাই, খুশী, তংচংগা, বংশাই, বোম, মুনী চাক, চোক, হরিজন, মুন্ডা ইত্যাদি – এগুলো আলাদা আলাদা জাতিগোষ্ঠী। এক গোত্র আরেক গোত্রের সাথে বিয়ে-বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। বৈবাহিক ক্ষেত্রে তারা বংশীয় সীমাবদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ। এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে শুধু "পাঙন" সম্প্রদায় ছাড়া অন্য উপজাতির অধিকাংশ লোক ধর্মান্তরিত হয়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। আবার ১০.৫ % হিন্দু জনসংখ্যার বিপুল পরিমাণ লোক ধর্মান্তরিত হয়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে।

মুসলমানের সন্তান নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে চিনে না, মেরী ও যীশুকে চিনে !

বাংলাদেশে খৃষ্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা ও আমাদের করণীয় (লেখক - মুফতী যুবায়ের আহমদ) বই থেকে-

বারিধারা নতুন বাজারের পিছনে একটি বড় বস্তি আছে। একদিন বিকালে বন্ধুবর মাওলানা মুজিব সাহেবসহ ঐ এলাকায় ঘুরছিলাম। চোখের সামনে পড়লো একটি স্কুল, সাথে গির্জা। স্কুলটি দেখে আমাদের কৌতূহল হলো।

স্কুলের সামনে ১০ / ১২ বছর বয়সের কয়েকটি ছেলে খেলাধুলা করছে। একজনকে তার নাম জিজ্ঞেস করলে "রাকিবুল ইসলাম" বলে উত্তর দিলো এবং এও জানতে পারলাম যে, সে এই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াশুনা করে। তাকে কালেমা জিজ্ঞাসা করলে "পারি না" বলে উত্তর দেয়। এবার আমাদের নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাম জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে বললো "জানি না"। এবার জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি মেরী বা যীশুকে চেনো ? সে উত্তর দিলো – হ্যা, চিনি। আবার জিজ্ঞাসা করলাম – কিভাবে চেনো। সে বললো, আমাদের স্যার আমাদের শিখিয়েছেন।

দেখুন, আমাদের উদাসীনতার সুযোগে আমাদের সন্তানদেরকে তারা খৃষ্টান বানাচ্ছে। এটাই হলো তাদের সেবার আসল রূপ।

মিশনারির স্বরূপ সন্ধানে

وَقَالُوۡا كُوۡنُوۡا هُوۡدًا اَوۡ نَصٰرٰى تَهۡتَدُوۡا ؕ قُلۡ بَلۡ مِلَّةَ اِبۡرٰهٖمَ حَنِيۡفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الۡمُشۡرِكِيۡنَ ١٣٥

ওরা বলে, 'তোমরা ইয়াহূদী বা নাসারা হয়ে যাও তাহলে সঠিক পথ পাবে'। বল, 'বরং একনিষ্ঠ হয়ে ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্গত ছিলেন না'।(আল-বাকারাহ:১৩৫)

পৃথিবী জুড়ে খৃষ্টধর্ম প্রচার কাজে তাদের সেবার ছদ্মাবরণে বহুরূপী কর্মকাণ্ড দেখে সচেতন মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে – "খৃষ্টধর্ম কি আসলেই কোন ঐশী ধর্ম ?"

তা যদি ঐশীই হয়, তাহলে মিশনারিদের খৃষ্টধর্ম প্রচার কাজে কেন এতো ব্যাপক কৃত্রিমতা, জালিয়াতি, অপপ্রচার ও প্রলোভন ? বর্তমানে খৃষ্টধর্মের ধ্বজাধারীগণ বিশ্বব্যাপী শান্তি তথা পাপ মুক্তির জন্য ত্রাণকর্তার ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ তারাই আড়াই শতাব্দী আগে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে বাদ দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠা করে। যার ফলে বর্তমান খৃষ্টধর্মের কেন্দ্রভূমি পাশ্চাত্যেই ব্যক্তি স্বার্থ, বর্ণবাদের উন্মত্ততা, নৈতিক অধঃপতন তথা অনৈতিক কর্মকাণ্ড বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে। খৃষ্টবাদের প্রচারকগণ এদেশেও তাদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থে নানা সূক্ষ্ম কুটচালের মাধ্যমে অগ্রসর হচ্ছে।

আজ তাই প্রতিটি সচেতন ধার্মিক ব্যক্তির তাদের এই অশুভ ও মানবতাবিরোধী কর্মতৎপরতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া আবশ্যক। আসুন তাদের রূপ উদঘাটন করি।

মিশনারি শ্রেণীবিভাগ

বিশ্বে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ১৫৬ টি প্রধান এবং ২৮,০০০ টি উপদল রয়েছে। মূল দলগুলোর মধ্যে দুটো দলই প্রধান – ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট। এদের মধ্যে শুধু ধর্ম-বিশ্বাসের পার্থক্যই নয় বরং মূল ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের মধ্যেও রয়েছে পার্থক্য। তাছাড়া তাদের বাইবেল সংস্করণগুলোর একটির সাথে অন্যটির বহুলাংশেই মিল নেই।

বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক

যদিও প্রচলিত খৃষ্টধর্ম ছিল সেমেটিক অর্থাৎ প্রাচ্যের, কিন্তু বর্তমানে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরাই এর ধারক-বাহক হয়ে বসেছে। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সরকার ও সংস্থার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য সহযোগিতায় খৃষ্টান মিশনারীরা বিশ্ব জুড়ে গড়ে তুলছে খৃষ্টধর্ম প্রচার ও প্রচারের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক।

প্রতিষ্ঠান ও প্রচার মাধ্যম

বর্তমানে ৭০ হাজারের বেশী মিশনারি ক্রুসেডার (ধর্ম যোদ্ধার) শিকার মুসলিম বিশ্ব। এ প্রেক্ষিতে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় গড়ে তুলেছে চার্চ ও বিভিন্ন ছদ্মবেশী সেবা, শিক্ষা ও আর্থিক দাতা প্রতিষ্ঠান "এনজিও" সমূহ।

সরাসরি মিশনারির মধ্যে "হ্যাগাই ইন্সটিটিউট" এমন একটি সংস্থা, যার কাজ হলো ধর্মের অসারতা প্রমাণ ও ইসলামের নবজাগরণকে প্রতিহত করা এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। এ ব্যাপারে জার্মান, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত থেকে প্রচুর নিষিদ্ধ ও ইসলাম বিরোধী বই এদেশে বহু কথিত বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, নাট্যকর্মী, কণ্ঠশিল্পী এবং প্রগতিবাদীদের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করছে। "হ্যাগাই ইন্সটিটিউট" ২০০০ অ্যালুমনই (সদস্য) নিয়ে ৫ টি মহাদেশের ৭০ টি প্রদেশে ১,০০,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। ২০০০ সালের মধ্যে ১০ লক্ষ মানুষকে দক্ষ প্রচারকরূপে প্রশিক্ষণ দিয়ে বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বে খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য পাঠাবার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। আন্তর্জাতিক খৃষ্টান মিশনারি

গবেষণা বুলেটিন থেকে প্রকাশিত এক পরিসংখ্যানের মাধ্যমে জানা যায় যে, ১৯৯১ সালে বিশ্বব্যাপী খৃষ্টধর্ম প্রচার ও ইসলামী জাগরণকে প্রতিহত করতে ১,২০,৮৮০ টি প্রতিষ্ঠান ও এজেন্সী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তার মধ্যে বাংলাদেশে প্রটেস্ট্যান্ট গোত্রের ইয়াং খৃষ্টান ওয়ার্কস এবং এভরী হোম কান্ট্রাস্ট, খৃষ্টান কমিশন ফর ডেভেলপম্যান্ট ইন বাংলাদেশ (সি. সি. ডি. বি.) ইয়াং ম্যানস খৃষ্টান এসোসিয়েশন (ওয়াই. এম. সি.) উল্লেখযোগ্য। তারা বাংলাদেশের নানা স্থানে বিভিন্ন নামে অসংখ্য সংস্থা স্থাপন করেছে। যেমন –

* নুর-ই-ইলাহী, পোস্টবক্স নং ৩৫০৭, ঢাকা,

* খোদার পথ, পোস্টবক্স নং ৫৮, ঢাকা – ১০০০,

* মাসীহী জামাত, পোস্টবক্স নং ৩৫০৭, ঢাকা,

* আল হানিফ কল্যাণ ট্রাস্ট,

* ডাকযোগে বাইবেল শিক্ষার জন্য পোস্টবক্স ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১৯৯৭ সালের তথ্য ও পরিসংখ্যানের সংরক্ষণ ও প্রচারে ব্যবহৃত হয় ৩১ কোটি ৫০ লক্ষ কম্পিউটার সেট। তাছাড়া ৩৪০০ রেডিও ও টেলিফোন সেন্টার খৃষ্টধর্ম প্রচারে নিয়োজিত ছিল। দেশে বর্তমানে "ঈমানের পথ" নামে ইসলামী আঙ্গিকে রেডিও অনুষ্ঠান চালু করেছে।

প্রকাশনা

বই প্রচার ও পত্রাদি বিলি

উল্লিখিত আন্তর্জাতিক খৃষ্টান মিশনারি গবেষণা বুলেটিন থেকে জানা যায়, খৃষ্টধর্ম বিষয়ক ১ লাখ ৯ হাজার ৯ শত ধরনের বই ও একত্রিশ হাজার তিনশত রকম ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয়। মুসলিম বিশ্বে বিনামূল্যে বিলিকৃত বাইবেলের সংখ্যা প্রায় ৬৩ কোটি ৯ লক্ষ ৪০ হাজার এবং মুসলমানদের জন্য ইসলামী পরিভাষায় রচিত বাইবেল অর্থাৎ "কিতাবুল মুকাদ্দাস" আঠারো কোটি তিরাশি লক্ষ তিরিশ হাজার। সর্বোপরি খৃষ্টবাদ, ইউরোপীয় ধর্মদর্শ ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লক্ষ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণ্যতম মিথ্যাচারে সমৃদ্ধ অগণিত পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশ করে চলেছে। ১৬ ই এপ্রিল ১৯৯৮ ইং সনে টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত এডওয়ার্ডের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ১৮৯০ সাল থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে অর্থাৎ ২৫ বছরে ইসলামের বিরুদ্ধে ষাট হাজার রকম বই প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও ভিডিও, অডিও ক্যাসেট প্রকাশ করা এবং "স্বর্গমত ম্যাগাজিন" উল্লেখযোগ্য।

প্রকাশনায় অপকৌশল

ধর্মগ্রন্থ ও সংস্থার নাম পরিবর্তন

মিশনারিরা মানুষকে ধর্মান্তরিত করার জন্য বিভিন্ন অপকৌশল অবলম্বন করে থাকে। যেমন খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ সারা বিশ্বে বাইবেল নামেই বহুল পরিচিত। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রভেদে নাম পরিবর্তন করার কৌশলে খৃষ্টান মিশনারিদের জুড়ি নেই। সর্ব প্রথম বাংলা ভাষায় খৃষ্টানরা বাইবেলকে "ধর্ম পুস্তক" নামে ১৯৬৩ সালে "পাকিস্তান বাইবেল সোসাইটি" থেকে প্রকাশ করে। পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশে একই সংস্থা "বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি" (বি. বি. এস.) তাদের গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করে "পবিত্র বাইবেল" নামে প্রকাশ করে। উল্লেখ্য, উভয় নামের বাইবেলে (তথাঃ ধর্ম পুস্তক – ১. "বাংলাদেশ বাইবেল", ২. "পবিত্র বাইবেল"; মৌলিকভাবে দুটো অংশ রয়েছে – ১. "নতুন নিয়ম", ২. "পুরাতন নিয়ম") পরবর্তীতে সংস্থার নাম পাল্টিয়ে "মসীহী জামাত" নামকরণ করে তাদের পবিত্র বাইবেলকে "কিতাবুল মুকাদ্দাস" নামে প্রকাশ করে। এই কিতাবুল মুকাদ্দাসে "পুরাতন নিয়ম" অংশের নামকরণ করেছে "তৌরাত, জবুর ও নবীদের কিতাব" এবং "নতুন নিয়ম" অংশের নামকরণ করেছে "ইঞ্জিল

শরীফ"। প্রমাণ্য ঐতিহাসিক সত্য হলো, ওসব নামের তৌরাত, জবুর ও ইঞ্জিল শরীফ আল্লাহ'র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ অবিকৃত কিতাব নয়।

মুসলিম ঐতিহ্যবাহী নকশা নকল

খৃষ্টান মিশনারিরা তাদের "কিতাবুল মুকাদ্দাস" ও "ইঞ্জিল শরীফ" এর মলাট সম্পূর্ণ ইসলামী ঐতিহ্যের ধারক প্রচ্ছদে অলংকৃত করে প্রকাশ করেছে। বিভিন্ন রঙের সুদৃশ্য কভারের উপর সোনালী রঙের ইসলামী ধাঁচের প্রচ্ছদ দেখে এটাকে পবিত্র কুরআনের তাফসীর বা পবিত্র হাদিসগ্রন্থ বলে ভুল করা অস্বাভাবিক নয়।

তারা এখন তাদের যাবতীয় ধর্মীয় বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, পত্রাদির প্রচ্ছদ, মসজিদ, কালেমা, আরবি বর্ণের শৈল্পিক নকশা দ্বারা অলংকৃত করার অপকৌশল অবলম্বন করছে। এমনকি ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি যেমন পর্দা, নামায, নারী শিক্ষা, ওযু ইত্তাদিকে বিকৃত উপস্থাপনে ও বক্তব্যে সমৃদ্ধ করে বই প্রকাশ করে চলেছে।

ইসলামী পরিভাষা ও নামাবলী ব্যবহার

খৃষ্টান মিশনারিরা এতটুকুতেই ক্ষান্ত হয়নি। তারা তাদের ধর্ম গ্রন্থের নাম পরিবর্তনের সাথে সাথে ইসলামী পরিভাষা, শব্দ ও নামাবলী চুরি করে তাদের ধর্মগ্রন্থ ও বইগুলো প্রকাশ করে চলেছে। তাদের পবিত্র বাইবেলের কিছু শব্দ উল্লেখ করা হলো, যে শব্দগুলোকে তারা তাদের গ্রন্থ কিতাবুল মুকাদ্দাসে ইসলামী পরিভাষা ও নামের রূপ দিয়েছে (কিতাবুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তিত রূপ ব্র্যাকেটে উল্লেখ করা হলো) –

আদিপুস্তক (আল-তৌরাত), প্রথম সিপারা (পয়দায়েশ), পরমগীত (নবীদের কিতাব সোলায়মান), গীতসংহিতা (আল জবুরঃ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম সিপারা), ঈশ্বর (আল্লাহ), ঈশ্বর পুত্র (ইবনুল্লাহ), পরিত্রাণ (নাজাত), ভাববাদী (নবী), ভজনা (এবাদত), বিশ্বাস (ঈমান), ব্যবস্থা (শরীয়ত), আব্রাহাম (ইব্রাহীম), মোশি (মুসা), দায়ুদ (দাউদ), যীশুখৃষ্ট (ঈসা মসীহ), দূত (ফেরেশতা), শির্ষ (সাহাবী), প্রায়শ্চিত্ত (কাফফারা), উবড় (সিজদা), যাচঞা (মুনাজাত), অলৌকিক কার্য (মোযেজা) ইত্যাদি।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম জালিয়াতি

সর্বোপরি তাদের নির্লজ্জ ও জঘন্যতম জালিয়াতির দৃষ্টান্ত হলো দীর্ঘ ১৬ বছর সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার পর কুরআনের বিভিন্ন আয়াত চুরি করে প্রতিটি অধ্যায়ে আরবিতে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" দিয়ে শুরু করে তাদের কথিত ইঞ্জিল শরীফ প্রকাশ করেছে। অথচ তাদের কোন কিছু শুরু করা হয় "পিতা-পুত্র ও পবিত্র আত্মা" এর নামে। বিশ্বের ইতিহাসে ধর্মের নামে এতো বড় জালিয়াতির নজির আর নেই।

পবিত্র কুরআনের অপব্যাখ্যা

ইদানিং তাদের ঘৃণ্য প্রতারণা ও ধোঁকাবাজী চরমে পৌঁছেছে। তারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের আংশিক প্রয়োগ এবং নিজেদের মনগড়া বানোয়াট অনুবাদ ও বাইবেলের স্বপক্ষে অপব্যাখ্যা দিয়ে নানা রকম পুস্তিকাদি প্রকাশ ও প্রচার করছে। যেমন ত্রিত্ববাদের মাঝে আল্লাহ এক, ইঞ্জিল ও কুরআনে ঈসা কালিমাতুল্লাহ'র ব্যক্তিসত্তা রক্তমাংসের দেহে আবৃত, আমরা কিভাবে সালাত কায়েম করি ?

তারা এখন তাদের বইয়ে সরাসরি কুরআনের আরবি আয়াত সংযোজন করছে। মুসলমানরা কুরআনের আয়াতকে সম্মান করে বলে তাদের ঘরে মিশনারিদের রচিত বই-পুস্তক স্থান পায়। কালার সমৃদ্ধ তাদের এ বইগুলো পড়ে সরল মনের সাধারণ মুসলমানরা বিভ্রান্ত হয় এবং ঈমান আমল হারিয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামের পথ ধরে। এভাবে মিশনারিগুলো তাদের (ঈমান ধংসের) লক্ষ্যে পৌছতে সক্ষম হয়।

তাদের প্রত্যেক বইয়ের শেষে প্রশ্নপর্ব থাকে। সেগুলোর উত্তর প্রদানে আরো বই ও উপহারের আশ্বাস দেওয়া হয়। বইয়ের বিকৃত বিষয়ের কোন প্রশ্ন করার সুযোগ নেই। তবুও কেউ প্রশ্ন করলে তারা নীরবতার কৌশল অবলম্বন করে। এভাবে যে কোন মূল্যে পাঠক থেকে মিথ্যার সাক্ষ্য নিয়ে কুফরীর পক্ষে স্বীকৃতি আদায় করে নেয়।

এলাকা ও জনগণ নির্ধারণ

তারা সমগ্র বাংলাদেশকে প্রচারের আওতাভুক্ত করার জন্য ১৯৬৮ সালে ১লা সেপ্টেম্বর তৎকালীন ঢাকা মহাপ্রদেশের অধীনে পুরো পূর্ব পাকিস্তানকে চারটি ধর্ম প্রদেশে বিভক্ত করে, এগুলো হলো –

চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশঃ এ ধর্মপ্রদেশের আওতাভুক্ত এলাকা প্রদেশের সমস্ত দক্ষিণাঞ্চল।

দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশঃ দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে এ ধর্মপ্রদেশ। এ ধর্মপ্রদেশের পরিধি যমুনা নদীর পশ্চিমাঞ্চল তীর থেকে দক্ষিণে পদ্মা এবং পশ্চিমে ভারতীয় সীমান্ত এলাকা পর্যন্ত।

খুলনা ধর্মপ্রদেশ।

ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ।

এ সকল এলাকায় তারা সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করছে। আর হবেই না কেন ? তাদের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে বিশাল অর্থের যোগান। ১৯৯৭ সালে খ্রিস্টবাদের প্রচার সংস্থাগুলোর মধ্যে শুধু ওয়ার্ল্ড ভিশনের অর্থ পরিকল্পনা ছিল ২১২৯ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার।

প্রচার ও প্রচারণার অপকৌশল

নকল ইমাম তৈরি

তারা গোপনে খৃষ্টান দেশগুলোতে ছদ্মবেশী ইমাম তৈরি করে মুসলিম দেশে পাঠিয়ে দেয়। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসকে নষ্ট করে তাদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করাই হলো এর মূল উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে মধ্যপ্রাচ্যে পাদ্রীদের সম্মেলনে "জবাজ" নামক এক পাদ্রী বিশেষ সভায় সভাপতিত্বের ভাষণে বলেনঃ মুসলমানদের সাথে বিতর্কে আমরা বিজয়ী হতে পারবো না। তাই আমরা তাদের পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ লাগিয়ে দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করছি। এটা আমাদের সফলতার একমাত্র পথ। সুতরাং আমাদের সবাইকে দেশে বিদেশে এ ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে।

ইসলামী নাম ধারণ

তারা এখন ইসলামী কায়দায় নাম রাখতে শুরু করেছে, যেমন – আবদুল ওয়াহহাব, সুলতান আহমেদ পৌল ইত্যাদি। তারা আরো একধাপ এগিয়ে নিজেদের খৃষ্টান পরিচয় না দিয়ে নিজেদের পরিচয় দেয় ঈসায়ী মুসলমান। তারা কালিমাও বানিয়েছে – লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ঈসা মসীহুল্লাহ।

যুবতী প্রচারক

খৃষ্টান মিশনারির নারী সদস্যরা তাবলীগের ছদ্মবেশে মুসলিম নারীদের ধর্মান্তরিত করার অপতৎপরতা চালাচ্ছে। তাদের প্রশিক্ষিত খৃষ্টান নারীরা (ধর্মান্তরিত করার) লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য মুসলমানদের সাথে বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হচ্ছে, যাতে পরবর্তী জেনারেশনকে তাদের ধর্মে দীক্ষিত করতে পারে। কারণ স্বামী মুসলমান হলেও পরবর্তী জেনারেশনই তাদের টার্গেট। এমনকি মহিলা ফেরীওয়ালাদের মাধ্যমে তারা ধর্মপ্রচার করে থাকে।

সাঁওতাল ভাইদের কি খবর ?

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোক বেশীরভাগ বসবাস করে রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর তথা উত্তরাঞ্চলে।

পীরগঞ্জ থানার একটি পল্লীর কথা আলোচনা করবো, এই তথ্যটি "ধর্মান্তরের খোলা হাওয়া" ৭১ নং পৃষ্ঠা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এটা সাঁওতাল উপজাতির একটি দরিদ্র পল্লী। এ অঞ্চলে এ ধরনের বেশ কয়েকটি উপজাতি পল্লী আছে। যেমন – চৈত্রকল (মাহেলিপাড়া), খালিসা (মিশনপাড়া), বসুদেবপুর (ডুমারপাড়া), অনন্তরামপুর, দুর্গাপুর, উধলাপাড়া, পৈত্রীপাড়া, কাদিরাবাদ, মুনাইল ইত্যাদি।

এরা সবাই উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও সাঁওতাল, বুনো, উড়াও ও পৈত্রী ইত্যাদি নামে বিভক্ত। এদের পেশারও ভিন্নতা রয়েছে। কেউ বাঁশ-বেতের কাজ করে, কেউ করে কৃষি কাজ। এদের কারো স্থায়ী আয়ের কোন উৎস নেই। মুসলমান পাড়ায় গতর খেটে এবং বাঁশ-বেতের জিনিসপত্র বিক্রি করে তারা জীবিকা নির্বাহ করে। এরা অত্যন্ত নিরীহ ও শান্ত প্রকৃতির। আলোচিত পল্লী রংপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার "চৈত্রকল ইউনিয়নে" অবস্থিত। এ ইউনিয়নের উপজাতির সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার। তারা সবাই নিজেদেরকে আদিবাসী হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে।

ক্ষুধা এদের নিত্যদিনের সাথী, দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত জীবন, দারিদ্রের নির্মম ক্ষতচিহ্ন এদের চেহারায়। বঞ্চনাকে ওরা ভাগ্যের নির্মম পরিহাস হিসেবে মেনে নিয়েছে। দুঃখ ও যন্ত্রণাকে ওরা ভাগ্যলিপি হিসেবে ধরে নিয়েছে। তাই এর জন্য ওদের কারো প্রতি ক্ষোভ ও খেদ নেই। আছে শুধু জীবনের অচল চাকা একভাবে চালিয়ে নেওয়ার নিরন্তর প্রয়াস। জীবনের গ্লানি ও যন্ত্রণা ভুলে থাকার জন্য হয়তো তারা মদ ও নেশা প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ হিসেবে বেছে নিয়েছে। সভ্যতার আলো আজও ঐ দরিদ্র পল্লীতে প্রবেশ করেনি। তারা এখনো আদিম প্রথায় জীবন চালায়। শিক্ষা, চিকিৎসা এ অন্ধকার পল্লী থেকে নির্বাসিত।

তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানও অত্যন্ত সীমিত। বছরে একবার তারা ডালপূজা করে। অর্থাৎ গাছের একটি ডাল আসরের মধ্যভাগে পুঁতে তাকে ঘিরে সারারাত নারী-পুরুষ কীর্তনের মাধ্যমে অতিবাহিত করে। কৃষি মওসুমে যখন কাজ থাকে, তখন তারা মুসলমান পাড়ায় গিয়ে বিত্তবান ও স্বচ্ছল লোকদের বাড়িতে মজুরী খাটে। যখন কাজ থাকে না, আকালের সময়

বনে জঙ্গলে বিভিন্ন গাছের পাতা ও বনজ আলু কুড়িয়ে আনে। হলুদ মরিচ মসলা ছাড়া শুধু লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে আলু দিয়ে তারা ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করে। শীতের সময় এসব মানব সন্তানরা শীত নিবারণের জন্য আদিম প্রথায় উঁচু করে মাচা বাঁধে আর নিচে আগুন জ্বালিয়ে বসে রাত কাটায়। রংপুর, পীরগঞ্জ অঞ্চলে ছয় মাস পর্যন্ত আকাল থাকে। তখন তাদের কাজ থাকে না। আবার যারা বাঁশ-বেতের কাজ করে, তারাও তাদের পণ্য বিক্রি করতে পারে না। তখন জীবন একেবারে অচল হয়ে পড়ে। মুসলমান পাড়ায় গিয়ে চেয়ে-চিন্তে ধার-কর্জ করে চলতেও তারা অভ্যস্ত নয়। অভাবের সময় এসব দরিদ্র পল্লীতে সরকারী- বেসরকারী পর্যায় ঋণদানেরও কোন প্রথা চালু নেই।

সবচেয়ে ভয়াবহ চিত্র রংপুর জেলার চৈত্রকল ইউনিয়নের। সেখানকার ছাব্বিশটি পরিবার প্রায় সবাই ইতিমধ্যে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। চৈত্রকলস্থ "খলিশা মিশন" এ বিষয়ে অগ্রণী ভুমিকা পালন করে চলেছে। পল্লীর নিভৃতকোণে নীরব বিপ্লব সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বিশাল জমির উপর প্রতিষ্ঠিত খালিশা মিশনে স্থায়ীভাবে বহুলোক কর্মরত আছেন। এ মিশনে আছে চিকিৎসা সেবা ও দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ।

মাহেলী পাড়ার জনসংখ্যা প্রায় দুইশত। ওখানে সদ্য নির্মিত হয়েছে মনোরম একটি গির্জা। এর তত্ত্বাবধান করেন লুইস দুখু। তাকে প্রশ্ন করা হলো, উপজাতি সম্প্রদায় এদেশের হাজার হাজার বছরের সংস্কৃতির অঙ্গ। এ ঐতিহ্য-চ্যুতির কারণ কি ? উত্তরে তিনি জানান, আমরা অবহেলিত সম্প্রদায়। আমাদের খোঁজ-খবর নেওয়ার কেউ নেই। খৃষ্টানরা আমাদের কাছে আসে, তারা আমাদের সুখ-দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করে। তাদের আদর-যত্ন আমাদের আকৃষ্ট করছে। খৃষ্টানরা কোন বৈষয়িক বিষয়ে সাহায্য প্রদান করে কিনা, এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, কই, তারাও তো কোন সাহায্য করছে না।

উধলাপাড়ার অশীতিপর বৃদ্ধা নৌরি, স্বামী রামধন। তার কাছে জানতে চাওয়া হলো, জীবন কেমন চলছে ? উত্তরে তিনি বললেন, কষ্ট করে চলি। সেখানকার উপজাতিদের দারিদ্র্য বিমোচনের কোন প্রকার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়নি। এ দরিদ্র পল্লী আগে যে তিমিরে ছিল আজও সেই তিমিরেই আছে। হওয়ার মাঝে হয়েছে শুধু উপজাতির ধর্মীয় পরিচয় বিলুপ্তি। সুচতুর খৃষ্টানরা হয়তো জানে, কোন জাতি ও সম্প্রদায়কে ছলে-বলে, কৌশলে একবার ধর্মান্তরিত করতে পারলে তাদের প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ সাময়িক। তারপর প্রজন্মের পর প্রজন্ম জানবে – তারা খৃষ্টানের ঘরে খৃষ্টান।

এ তো হলো একটি ইউনিয়নের প্রতিবেদন, এ ছাড়া কতো ইউনিয়ন গ্রাম রয়েছে, সেখানে যারা এদের মতো বা এদের চেয়ে বেশী আমাদের কাছে সর্বদা অস্পৃশ্য সম্প্রদায় হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। আমরা তাদের খোঁজ-খবর নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না, যা ছিল আমাদের কর্তব্য, দায়িত্ব ও ঈমানি ফরিযা। পাশে না দাঁড়ানোর ফলে সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়ে খৃষ্টান মিশনারিরা তাদের পাশে গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে ধর্মান্তরিত করছে। উচিৎ তো ছিল আমরা তাদের খোঁজ খবর নিবো।

উপজাতি সম্প্রদায় আমাদের প্রতিবেশী। তারা আমাদের সেবা দিয়ে যাচ্ছে। নিবেদিত প্রাণ এসব হতদরিদ্র আদম সন্তানদের খোঁজ নেওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু আমরা কি এ দায়িত্ব পালন করছি ? অথচ প্রতিবেশীর সেবা ও খোঁজ নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের গৌরবের সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।

ইসলাম আমাদেরকে প্রতিবেশীর কর্তব্য পালনের জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছে। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদিস বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন –

"যে ব্যক্তি পেটপুরে খায়, অথচ তার প্রতিবেশী অনাহারে রাত পোহায়, সে আমার উম্মত নয়।"

অন্যত্র রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন –
"আল্লাহ'র শপথ, সে ব্যক্তি মুমিন নয়।" এভাবে তিনবার বললেন। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), এ কোন ব্যক্তি।" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "যার ক্ষতি থেকে তার প্রতিবেশীর সম্পদ ও ইজ্জত নিরাপদ নয়।" এ থেকে প্রতিবেশীর অধিকারের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। এতে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টানের কোন পার্থক্য নেই। প্রতিবেশী যে পরিচয়েই হোক, তার প্রতি বিশেষ কর্তব্য পালনকে ইসলাম বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। এ মহান কর্তব্যটুকু আমাদের পূর্ববর্তীদের দ্বারা যথাযথভাবে পালিত হয়েছিলো বিধায় দলে দলে লোক ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে।

বড় আফসোস! আমরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের হতভাগা অংশ (নোটঃ লেখক "হতভাগ্য উম্মত" লিখেছিলেন, আমি সেটা চেইঞ্জ করে দিয়েছি)। আরা রাসুল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসৃত নীতি বিচ্যুত হয়েছি। সেজন্য এতো দুর্গতি ও লাঞ্ছনা। এখানে একটি কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় – আজ আমরা যাদের অবহেলা ও তাচ্ছিল্য ভরে দূরে সরিয়ে রাখছি, যাদের প্রতি আমাদের ন্যূনতম কর্তব্যবোধ আছে বলে মনে করছি না। হয়তো এমন দিন বেশী দূরে নয়, যেদিন এসব অবহেলিত সম্প্রদায় একটি বৃহৎ জাতিতে রূপ নিবে। তারা প্রশিক্ষিত হবে, আর অতীত বঞ্চনা ও প্রবঞ্চনার জন্য আমাদের দায়ী করবে। স্থায়ীভাবে আমাদের মাথা ব্যাথার কারণ হবে। তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত লেবানন। সেখানে খৃষ্টানরা স্থায়ীভাবে গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে একটি সমৃদ্ধ মুসলিম দেশকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

ইসলাম হলো আমাদের কাছে আমানত। আমরা কি এই আমানত তাদের কাছে পৌঁছিয়েছি ? ইসলামের দাওয়াত পাওয়া তাদের অধিকার। আমরা কি তাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিনি ? এখনো সময় আছে তাদের পাশে দাঁড়াবার। এখনো সময় আছে তাদের আমানত পৌঁছানোর। আসুন, আজ থেকে আমরা তাদের হক পৌঁছে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করি। জাহান্নামের পথ থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতের পথ দেখিয়ে দেই। যা ছিল আমার আপনার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় সুন্নাত।

একটি পরিসংখ্যান

দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন মূল দাবী হলেও তাদের কোন কোন এনজিও এসব কর্মকাণ্ডের আড়ালে খৃষ্টান মিশনারির "ধর্মান্তর কর্মসূচি" প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তারা সমাজের অনগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণীকে ধর্মান্তরের প্রধান টার্গেট বানায়। খৃষ্টান মিশনারি ও তাদের সহযোগী এনজিওগুলো কাজের ও কর্মসূচীর দিক দিয়ে ভিন্ন হলেও তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অভিন্ন। উভয়ের প্রধান লক্ষ্য বিশ্বে খৃষ্টান জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটানো। এ লক্ষ্য সামনে রেখে আমাদের দেশে এনজিও ও মিশনারিগুলো কাজ করে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে তারা অনেকটা সফল। বাংলাদেশের খৃষ্টান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার লক্ষ্য করলে সে কথার প্রমাণ মিলে।

১৮৮১ সালে প্রতি ৬ হাজার লোকের মাঝে ১ জন খৃষ্টান ছিল। সে সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭৪ সালে প্রতি ৩২৬ জনের মাঝে ১ জন, ১৯৮১ সালে প্রতি ২৯ জনের মাঝে ১ জন, ১৯৯১ সালে প্রতি বাইশজনের মাঝে একজন খৃষ্টান রয়েছে বলে রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। ১৯৩৯ সালে খৃষ্টান জনসংখ্যা ছিল ৫০ হাজার। তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯১ সালে আদমশুমারিতে খৃষ্টান জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০ লাখে। ২০০১ সালের আদমশুমারিতে খৃষ্টান জনসংখ্যা ১ কোটি ছাড়িয়ে গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ঢাকায় খৃষ্টানদের সবচেয়ে বড় গির্জা "হলি রোজারি"। ১৮৭৭ সালে পর্তুগিজ ব্যবসায়ীগণ এটি নির্মাণ করেন। ১৯৫২ সালে উক্ত গির্জায় উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ১৫৩ জন আর ১৯৭৬ সালে তা ৩০০০ জনে উন্নীত হয়, ১৯৮৩ সালে উপস্থিতি ৬০০০ জনে আর ১৯৯৮ সালে উপস্থিতির সংখ্যা ৫০,০০০ এ পৌঁছে।

বাংলাদেশে এনজিও ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী বিদেশী সাহায্যপুষ্ট এনজিও সংখ্যা ৮৫০। এর বাইরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধন নিয়ে কাজ করছে এমন এনজিওর সংখ্যা বিশ থেকে ত্রিশ হাজার অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রতি ১.১৮ বর্গমাইলের মাঝে একটি এনজিও কাজ করছে।

বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রমের বিস্তার সম্পর্কিত ব্যাপারগুলোর পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ পর্যন্ত এনজিও আওতাধীন গ্রামের সংখ্যা ৪০ হাজার, পরিবারের সংখ্যা ৩৫ লাখ। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে এনজিওদের বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১ হাজার কোটি টাকা। উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩০ হাজার। ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যা ১০ লাখ, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র

৪৪ লাখ, এনজিওদের রোপণকৃত বৃক্ষের সংখ্যা ৪ কোটি। উপরোক্ত তথ্য ও সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয়, তখন খৃষ্টানদের সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ। কিন্তু ২০১০ সালে মদিনা ইউনিভার্সিটি একটি পরিসংখানে দেখায়, বাংলাদেশে বর্তমান খৃষ্টানদের সংখ্যা ১০ মিলিয়ন অর্থাৎ ১ কোটি। আর বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১৫ কোটির ঊর্ধ্বে। মুসলমানদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। আর খৃষ্টানদের সংখ্যা প্রায় ১৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন প্রশ্ন জাগে, তারা কি একজন ১৩ জন করে সন্তান জন্ম দিয়েছে ? আবার, জন্মনিয়ন্ত্রণ থিওরি তাদেরই মতবাদ। যদি বলা হয়, না; তাহলে এই বাকি জনসংখ্যা এলো কোত্থেকে ? অবশ্যই এরা ধর্মান্তরিত খৃষ্টান।

কি হচ্ছে দিনাজপুর ও পঞ্চগড়ে ?

লোমান তপন, পিতা মরটিন তপন। চকবানারসি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি উপজাতি খৃষ্টান, অর্থাৎ তিনি পূর্বে উপজাতি ছিলেন, বর্তমানে তিনি খৃষ্টধর্মাবলম্বী। তিনি জানান, চকবানারসি অঞ্চলে “নিচপাড়া মিশন” এর প্রচেষ্টায় প্রায় ৫ শত পরিবার খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। নিচপাড়া মিশনটি এ প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেবার আড়ালে ধর্মান্তরিতকরণের কাজে ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। এটি ইটালিয়ান মিশন। এখানে দুজন ফাদার ও চারজন সিস্টার সার্বক্ষণিকভাবে মিশনের দায়িত্ব পালন করছেন। এ মিশনটি বীরগঞ্জ থানার উত্তরে, প্রায় তিন মেইল ভিতরে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। বিশাল জায়গা নিয়ে এর অফিস ভবন, গির্জা ও মিশনারি স্কুল স্থাপিত হয়েছে।

এছাড়াও মিশনের বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে চাকরিদানের লোভনীয় টোপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় লোকজনের অভিযোগ, খৃষ্টান মিশনারিগুলোতে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ না করলে চাকরি মিলে না। চাকরির প্রলোভনে পড়ে অনেক মুসলমান বিভ্রান্ত হচ্ছে। তারা প্রকাশ্যে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ না করলেও ভিতরে ভিতরে পুরোদস্তুর খৃষ্টধর্মনিষ্ঠ। মুসলমান ছেলে-সন্তানদের খৃষ্টধর্মে আকৃষ্ট করার জন্য মিশনারিগুলোতে প্রায়শই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে আকর্ষণীয় কর্মসূচী পালন করা হয়। এসব কর্মসূচীতে আকৃষ্ট হয়ে আশেপাশের মুসলমান সন্তানরা নিয়মিত মিশনে যাতায়াত করছে। ফলশ্রুতিতে নতুন প্রজন্মে খৃষ্টানিজম

মানসিকতা গড়ে উঠছে। (বীরগঞ্জ উপজেলা সদর থেকে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে লুথারেন মিশনের প্রতিবেশী)। এ তো ছিল থানার প্রতিবেদন, তারপরেও এটি হলো আজ থেকে প্রায় ৭/৮ বছর পূর্বে। এখন একটু অনুমান করুন, এই সাত / আট বছরে পরিস্থিতি কীরূপ হতে পারে। এই অধমের জন্মও সেই বীরগঞ্জ থানায়, তাই প্রায়ই তাদের সামনাসামনি হতে হয়। এক সময় দেখতাম, আমাদের (_?_) এলাকার সাঁওতালরা ধানক্ষেত ও জঙ্গল থেকে ইঁদুর ও শিয়াল ধরে খেতো আর সাধারণভাবে চলাফেরা করতো। আমরা যেহেতু তাদের কাছে যাইনি, তাদের পাশে দাড়াইনি, ফলে ভিন দেশ থেকে লাল চামড়ার লোকেরা তাদেরকে শিক্ষিত বানিয়েছে। একদিন এক সাঁওতাল ভাইয়ের সাথে কথাবার্তা হচ্ছিলো, সে গর্বের সাথে বলছিলো – আমাদের অমুক ডাক্তার খৃষ্টান, আমাদের অমুক অফিসার খৃষ্টান।

এই তো এই বছরের শুরুর দিকে একদিন বীরগঞ্জ উপজেলার শহর থেকে ভ্যানে করে বাড়িতে ফিরছিলাম। মেইন রাস্তার পাশে সারিবদ্ধ ছোট ছোট মাটির ঘরের এক বিস্তীর্ণ মহল্লা। মহল্লাটি সাঁওতালদের। হঠাৎ দেখি রাস্তার পাশে মহল্লার মাঝে নতুন একটি ঘর, সেখানে কিছু ছেলে মেয়ে সারিবদ্ধভাবে হাঁটুতে ঠেক দিয়ে কি যেন বলছে, আমার কৌতূহল সৃষ্টি হলো। কারণ ইতিপূর্বে এমনটি কখনো দেখিনি, যদিও আমার যাতায়াত সাধারণত এ পথেই হয়ে থাকে। ভ্যানগাড়ি থামিয়ে সেখানে গেলাম আর একজনকে জিজ্ঞেস করলাম যে এখানে কি হচ্ছে। লোকটি উত্তরে বললো – উপাসনা হচ্ছে। আবার প্রশ্ন করলাম – কিসের উপাসনা। সে বললো – ক্যাথলিকদের উপাসনা। ক্যাথলিক ! ক্যাথলিক তো খৃষ্টান। সে বললো – আমরাও তো খৃষ্টান। আমি বললাম – আপনারা তো খৃষ্টান ছিলেন না, আপনারা তো সাঁওতাল। কতদিন আগে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছেন ? জবাবে বললো – এই তো কয়েকদিন হলো। কেন খৃষ্টান হলেন ? বললো – তারা আমাদের ঋণ প্রদান করে, আমাদের কাছে আসে। আমি সেই লোকটিকে বুঝালাম আর ইসলাম ধর্মের দাওয়াত দিলাম। সে উত্তরে বললো – আপনি তো আগে আসেননি, আগে বললে আমি ইসলামধর্ম গ্রহণ করতাম, এখন সম্ভব না। কারণ আমাদের গোষ্ঠীর সকলেই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছেন। আমি মুসলমান হলে সবকিছু ছেড়ে চলে যেতে হবে। এ তো ছিল সাঁওতাল বস্তির কথা। এমন আরো যে কতো মুসলিম পরিবারকেও খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করছে, তা কি আমরা খবর রাখি ?

আমার বন্ধু মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেব আমাকে বলছিলেন, আপনার পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ কারিতাসের দাওয়াতে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে তা কি খবর রাখেন ? তিনি আরো বললেন – আমি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পেরেছি যে, এদের কয়েকজন খৃষ্টান নিজেদের পরিচয় গোপন রাখে, খৃষ্টান বলে প্রকাশ করে না।

আপনিও আপনার আশেপাশে খোঁজ করলে এমন অনেক মানুষ পাবেন, যারা মিশনারিদের ধোঁকায় বিভ্রান্ত। এদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। এ কর্তব্য পালনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের ব্রতী হওয়া আবশ্যক। নতুবা পরিণতি কি দাঁড়ায় তা বলা কঠিন।

খৃষ্টানদের চ্যালেঞ্জ

রমযানুল মুবারাকের শেষ দিনগুলোতে ঈদুল ফিতরকে কেন্দ্র করে বাড়ি যাওয়ার ধুম পড়ে। আমি দুজন নওমুসলিমকে নিয়ে আমার বাড়ি দিনাজপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমরা কমলাপুর স্টেশনে যাচ্ছিলাম, এমন সময় মোবাইল ফোন বেজে উঠলো। রিসিভ করে সালাম বিনিময়ের পর বুঝতে পারলাম, ফোন করেছেন মাওলানা রায়হান সাহেব (সম্ভবত তিনি জামিয়া নূরিয়া কামরাঙ্গির চর মাদরাসার দারুল ইকামা হোস্টেল পরিচালক)। তিনি বললেন – যুবায়ের ভাই, কয়েকদিন ধরে ফোন করছি, আপনাকে পাচ্ছি না। মাওলানা ওমর আলী সাহেবকেও পাচ্ছি না। আমি বললাম, হুজুর তো উমরার সফরে গিয়েছেন। এবার বলুন, কি খেদমত করতে পারি ? তিনি বললেন – আমাদের মাদ্রাসার এবতেদায়ী শ্রেণীর এক ছাত্র নাজিবুর রহমান জানালো, তাদের এলাকায় খৃষ্টানরা চ্যালেঞ্জ করেছে যে, আমরা তোমাদের কিছু প্রশ্ন করবো, যদি উত্তর দিতে পারো তাহলে আমরা মুসলমান হয়ে যাবো। আর যদি উত্তর দিতে ব্যর্থ হও, তাহলে তোমাদেরকে খৃষ্টান হতে হবে। এলাকাবাসী উত্তর খোঁজার লক্ষ্যে এই এবতেদায়ী ছাত্রের কাছে এসেছে। কারণ সে-ই ঐ এলাকার বড় হুজুর। এখন ছেলেটি এ বিষয়ে আমাদেরকে জানিয়েছে। যেহেতু দীর্ঘদিন আপনারা খৃষ্টান মিশনারির তথ্য অনুসন্ধান ও তাদের অপতৎপরতা প্রতিরোধের সাথে জড়িত, তাই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছেন কি ?আমি বললাম, অবশ্যই। ইন শা আল্লাহ।

আমি ঐ ছেলের নাম, মোবাইল নাম্বার ও পূর্ণ ঠিকানা সংগ্রহ করলাম। জানতে পারলাম, স্থানটি হলো দিনাজপুরের ফুলবাড়ী থানা। বিষয়টি নিয়ে ভাবতেই আমার খুব কান্না পেলো, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশে বাস করে সত্য ধর্ম ইসলামের অনুসারী হয়ে মিথ্যার উপর ভর করা ভিত্তিহীন, বিকৃত ধর্মানুসারীর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয় ! এর জন্য আমরাই দায়ী। দায়িত্বে অবহেলার কারণেই এমন পরিস্থিতির শিকার হতে হচ্ছে।

যাই হোক, ২৮ রমযানে বাড়ি ফিরলাম, চিন্তা – ঈদের আগের দিনই যাবো। ফোনে যোগাযোগ করে ঈদের পর তৃতীয় দিন বিতর্কের তারিখ ঠিক হলো। তৃতীয় দিন সকাল সকাল আমি বীরগঞ্জ থেকে রওনা হলাম, বন্ধু সারওয়ার ও ইমরান ভাইসহ সেই অজপাড়া গাঁয়ে পৌঁছলাম।

সেই এলাকায় খৃষ্টান মিশনারি "ওয়ার্ল্ড ভিশন সংস্থা" এলাকার মহিলাদের গরু, ছাগল ঋণ দেয় এবং প্রতি মাসে পশুপাখি কিভাবে লালন-পালন করবে তারও প্রশিক্ষণ দেয়। প্রশিক্ষণেরই এক পর্যায়ে কুরআনের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করে, ধর্মান্তরিত করার লক্ষ্য বাস্তবায়নের তৎপরতায় লিপ্ত হয় এবং গ্রাম্য সরলমনা মহিলাদের এ বলে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে যে, যদি তোমরা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারো, তাহলে অফিসের আমরা সকলেই মুসলমান হয়ে যাবো। আর যদি উত্তর না দিতে পারো তাহলে তোমরা সকলেই খৃষ্টান হয়ে যাও। সেই মহিলারা মাদ্রাসার ছাত্র নাজিবুর রহমানকে প্রশ্নগুলো জানালো।

আমাদের আগমনে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। ঢাকা থেকে উলামায়ে কেরামের আগমন টের পেয়ে ওয়ার্ল্ড ভিশনের লোকেরা হতচকিত হয়ে পড়লো। বহু চেষ্টা করেও তাদের সাথে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। মোবাইলও ছিল বন্ধ।

এ হলো মিশনারিগুলোর অবস্থা। মুখে মুখে সেবার মোহনীয় শ্লোগান। এর আড়ালে জনগণের সরলতার সুযোগে ধর্মান্তরের চেষ্টা। এ ব্যাপারে এখনই সতর্ক করা আমাদের কর্তব্য।

মসজিদের খতীব খৃষ্টান

২০০৯ সালে এক সফরে লালমনিরহাটের আদিতমারি থানায় যাই। সেখানে যাওয়ার পর এলাকার মানুষ জানালো যে, আমাদের এলাকায় একজন খতীব সাহেব আছেন যিনি মসজিদে জুমআর খুতবায় এমন কিছু কথা বলেন, যা আপত্তিকর। তিনি বলেন, নামায পড়তে পড়তে যদি কারো কপালে দাগ পড়ে যায় তবুও সে জাহান্নামে যাবে। খতীব সাহবে আরো বলেন, কেয়ামতের পূর্বে ঈসা আলাইহিস সালামের পুনরাগমন ঘটবে। তখন তো তাকে মানতে হবেই। তাহলে এখন মানতে অসুবিধা কোথায় ? আরো বলেন – মাটির নিচের নবী উত্তম না আসমানের উপরের নবী উত্তম ? যিন্দা নবী উত্তম না মৃত নবী উত্তম ইত্যাদি। আমরা যখন খতীব সাহেবের ব্যাপারে অনুসন্ধান করলাম, জানা গেলো তিনি আল-হানিফ কল্যাণ ট্রাস্টের একজন সক্রিয় সদস্য। আর আল-হানিফ কল্যাণ ট্রাস্ট হলো খৃষ্টান মিশনারির ছদ্মবেশী একটি সংস্থা। সেবার আবরণের খৃষ্টধর্ম প্রচারই যাদের মূল লক্ষ্য। সেখানে সেকান্দার মাস্টার নামে আল-হানিফ কল্যাণ ট্রাস্টের একজন সদস্যের সাথে সাক্ষাৎ হলো, যিনি একটি মসজিদের সভাপতি। তিনি আমাদেরকে কুরআনের উপর উত্থাপিত খৃষ্টানদের শিখানো বিভিন্ন প্রশ্ন করতে লাগলেন। যেগুলো দিয়ে তারা সর্বসাধারণকে বিভ্রান্ত ও ধর্মচ্যুত করে থাকে।

ঝিনাইদহে মুরতাদদের সাথে একদিন

২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ভগবান গড় গ্রামের (শৈলকূপা থানা ঝিনাইদহ) সফরের কথা বলি। এ সফরে আমাদের রাহবার ছিলেন স্থানীয় কলেজের ছাত্র রাকিবুল ইসলাম ভাই। গিয়ে দেখি সেখানের অনেক মুসলমান খৃষ্টান হয়ে গিয়েছে। খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত স্থানীয় ঠাণ্ডামাতবর, এলাহী বখশ, বাদশা মিয়া আরো অনেকের সাথে সাক্ষাৎ হলো। তাদের সাথে কথাবার্তা চলছিলো। এক পর্যায়ে আমাদের আলোচনা মুনাজারার (বিতর্কের) রূপ নেয়, তবে তারা মুনাজারায় পরাজিত হয়। বিতর্কে অংশগ্রহণকারী তাদের একজন দাঈ "অমুল মাধুর্য" এর (যে ঐ এলাকায় ইয়াং সোসাইটির প্রধান) সাথে আমার খাতির জমে যায়। আমি তার দাওয়াতি কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাইলাম। উত্তরে তিনি বললেন, আমরা বই পুস্তক বিলি করি, বুঝাই আর আমাদের প্রোগ্রামগুলোতে দাওয়াত দেই। আমি ফের প্রশ্ন করলাম, আপনারা বই পুস্তকের টাকা পয়সা কোথায় পান ? উত্তরে বললেন, আমরা প্রত্যেকেই আয়ের এক দশমাংশ আল্লাহ'র রাস্তায় দান করি এবং দান করার পর সেদিকে ফিরেও তাকাই না। কেউ আমাদের খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলে তাকেও এই দানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করি। আমাদের দাওয়াতি

কাজের অর্থযোগান এভাবেই হয়। আর এভাবে সংগৃহীত টাকা দিয়েই আমরা বই পুস্তক কিনি আর বিতরণ করি। আমূল মাধুর্য জানালেন, তিনি একটি প্রাথমিক স্কুল পরিচালনা করেন। সেখানে মুসলমানের সন্তানরাও পড়াশুনা করে। তাদেরকে ইসলাম শিক্ষা নয় বরং খৃষ্টধর্মের দীক্ষা দেওয়া হয়। সেকুলার পদ্ধতিতে পড়ানো হয়। তিনি এ ধরনের বহু তথ্য দিলেন।

আমি মুসলিম ভাইদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, আমরা কয়দিন কয়টি বই আমার প্রতিবেশী অমুসলিমের হাতে তুলে দিয়েছি ? আমরা কতোভাবে আমাদের টাকা খরচ করি, একটি টাকাও কি অমুসলিম ভাইদের পিছনে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে খরচ করেছি ?

মুসলমানদের গ্রামে খৃষ্টানদের চার্চ

খবর পেলাম, জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ থানায় বহু মুসলমান খৃষ্টান হয়ে গিয়েছে, তাই ঐ অঞ্চলে সফর করি। প্রথমে মেলান্দহ জামিয়া হুসাইনিয়া মাদ্রাসায় গিয়ে সম্মানিত মুহতামিম, মুফতি শামসুদ্দিন সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করি। আমরা উভয়ে মাদারগঞ্জ থানার তেঘুরিয়া ইউনিয়নের কয়লাকান্দি গ্রামে পৌঁছি। সেখানে মুসলমানদের এলাকায় ন্যাজরিয়ান মিশনের একটি বিশাল গির্জা দেখতে পেলাম। ঐ এলাকার অনেক মুসলমানই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ করে ইসলাম ধর্মে ফিরে আসার দাওয়াত দেই। অনেকে বাইবেল ও কিতাবুল মুকাদ্দাস ফেরত দিয়ে স্বধর্মে ফিরে আসেন এবং তাওবা করেন। এভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে মিশনারিগুলো কাজ করে যাচ্ছে। অথচ তাদেরকে হেদায়েতের পথে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সামান্য অনুভূতিও আমাদের হয় না।

মাদারগঞ্জে কয়েক হাজার খৃষ্টান

৯ই ফেব্রুয়ারী ২০১১ ইং তারিখে মাদারগঞ্জের তেঘুরিয়া ইউনিয়নে আমাদের সফর হয়। সেখানে পৌছার পর স্থানীয় এক খৃষ্টান হাফেজ .... এসে আমাকে বললেন, আমাদের এখানকার প্রবীণ / মুরব্বী (যিনি ধর্মান্তরিত খৃষ্টান) আপনাদের সাথে কথা বলতে চান। তখন আমি অধম, বন্ধুবর মাওলানা নুরুল ইসলাম ও ইঞ্জিনিয়ার আমিনুল ইসলামসহ তার কাছে যাই। গিয়ে দেখি জালাল সাহেব আসন দিয়ে বসে আছেন। সামনে বিছানার উপর ছড়ানো পবিত্র কুরআন, যেন এ কোন সাধারণ বই-খাতা ! আর ডায়েরি দেখে তাতে কি যেন দাগাচ্ছেন। আমরা সালাম দিয়ে প্রথমে কুরআন শরীফটি বিছানা থেকে বুকে উঠিয়ে নিলাম। এরপর তার সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা হলো। তার আলোচনার বিষয় ছিল মিশনারিগুলোর শিখিয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলো। আমরা তার প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করতে লাগলাম, তিনি আমাদের উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে ব্যর্থ হলে তাদের বস (খৃষ্টান মিশনারিদের প্রধান) জাহাঙ্গীর আলম ওরফে লেবু ডাক্তারকে ফোন করলেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তরজমাতুল কুরআন, কিতাবুল মুকাদ্দাস ও কিছু নোট নিয়ে উপস্থিত হলেন। তার সাথে কিছুক্ষণ যুক্তিতর্কের পর বললাম, তর্ক কিংবা বিতর্ক কোনটি আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং সত্যকে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য। তাই আপনার প্রতি আহবান থাকবে, পুনরায় ইসলাম ধর্মে ফিরে আসবেন।

খৃষ্টান প্রচারকের সাথে বিতর্ক ও দাওয়াত

হালুয়া ঘাটের এক চার্চে ফাদারের সাথে আমরা কয়েকজন দেখা করি। প্রথমে তাকে সালাম দিলাম।

যুবায়েরঃ আসসালামু আলা মানাত্তিবাআল হুদা।

ফাদারঃ ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

যুবায়েরঃ কেমন আছেন ?

ফাদারঃ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন ?

যুবায়েরঃ আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি। আমরা আপনাদের চার্চ দেখতে এসেছি, দেখতে পারি কি ?

ফাদারঃ হ্যা, অবশ্যই দেখতে পারেন।

যুবায়েরঃ (চার্চ দেখতে দেখতে কিছু দাওয়াত) ফাদার সাহেব, দেখুন, আমাদের সমাজে একটি বড় ভুল বুঝাবুঝি আছে, তা হলো, আমরা যখন কোন হিন্দু বা খৃষ্টান ভাইদের দেখি, তাকে বিধর্মী মনে করে তার থেকে দূরে থাকি। হিন্দু খৃষ্টান ভাইরাও তাই করে। আসলে এমন করা ঠিক নয়। আমরা সকলেই মানুষ। আপনার কপালে লেখা নেই যে, আপনি খৃষ্টান। তদ্রূপ আমার কপালেও মুসলমান লেখা নেই। আমার চামড়া কাটলে রক্ত লাল হবে, আপনার চামড়া কাটলেও তাই। এর ব্যত্যয় হবে না। মূলত এই পার্থক্য আমরা নিজেরাই করে নিয়েছি। আমাদের মালিক কোন পার্থক্য করেননি। আমাদের প্রভু আল্লাহ সকলকে লক্ষ্য করে বলেন – "হে মানুষ সকল, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের উপাসনা করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন ......" এখানে মালিক কোন ভাগ করেননি। এই মালিক এক, তার সাথে কোন শরীক নেই।

ফাদারঃ হ্যা, হ্যা, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমাদের বাইবেলেও তা আছে।

যুবায়েরঃ আচ্ছা, আপনার কাছে অনেক কিছু জানা যাবে। আমি জানতে চাই, বাইবেল কি আল্লাহ'র কিতাব ?

ফাদারঃ হ্যা, এটা আল্লাহ'র কিতাব। আপনাদের কিতাবে যাকে তাওরাত, ইনজিল নামে অভিহিত করা হয়েছে।

যুবায়েরঃ বলুন তো, মানুষের লেখা চিঠি কি আল্লাহ'র কালাম হতে পারে ?

ফাদারঃ না, কখনো হতে পারে না।

যুবায়েরঃ আপনার দাবী অনুযায়ী মানুষের কথা আল্লাহ'র কিতাবে স্থান পেতে পারে না, অথচ নতুন নিয়মের ২৭ অধ্যায়ের মধ্যে ১৪ টি অধ্যায় হলো সেন্ট পোলের চিঠি। আর সেন্ট পোল

যীশুকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার অনেক পরে এসেছেন। সুতরাং তার চিঠিগুলো আল্লাহ’র কালাম হতে পারে না। প্রশ্ন জাগে, তা কিভাবে আপনাদের বাইবেলে স্থান পেলো!

ফাদারঃ উনি তো পবিত্র আত্মার সাহায্যে লিখেছেন।

যুবায়েরঃ যীশু তো বাংলাদেশীদের জন্য নবী নন। কারণ বাইবেলের মথির ২৪:১৫ তে আছে, যীশু বলেন – “আমি তো শুধু বনী ইস্রাইলের হারানো মেষদের জন্য প্রেরিত হয়েছি।” আর আমরা বাংলাদেশীরা বনী ইস্রাইলের লোক নই।

ফাদারঃ আমি এখন বলতে পারবো না, পরে আরো পড়াশোনা করে আপনাকে জানাবো।

যুবায়েরঃ দেখুন, আমাদের মাঝে আরেকটি ভুল বুঝাবুঝি আছে, তা হলো – হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাদের নবী ? যদিও আপনারা তাকে মুসলমানদের নবী আর আমরা আমাদের নবী বলি। কিন্তু কুরআনে বলা হয়েছে – তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকলের নবী। সুতরাং কুরআনের ভাষ্যানুযায়ী তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকলের নবী। তাই আপনাকে আহবান করবো তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি ঈমান আনবেন এবং কুরআনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তদনুযায়ী আমল করবেন।

ফাদারঃ আমার অনেক ইচ্ছা যে, কুরআন শরীফ পড়বো। একবার কুরআন শরীফ কিনতে গিয়েছিলাম, কিন্তু খৃষ্টান হওয়ায় আমার কাছে কুরআন শরীফ বিক্রি করেনি।

যুবায়েরঃ আমি আপনার কাছে একটি কুরআন শরীফ পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করবো ইন শা আল্লাহ। আজকে আসি। আসসালামু আলাইকুম।

বাং

লাদেশে খৃষ্টানদের ৬ টি ধর্মপ্রদেশ

বাংলাদেশে খৃষ্টানরা তাদের ধর্ম প্রচারের সুবিধার্থে পুরো দেশকে ৬ টি প্রদেশে বিভক্ত করেছে। যথা – (১) দিনাজপুর, (২) রাজশাহী, (৩) খুলনা, (৪) চট্টগ্রাম, (৫) ঢাকা, (৬) ময়মনসিংহ।

নীলফামারীতে মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার চাঞ্চল্যকর তথ্য

দৈনিক করতোয়ার ২১ এপ্রিল ২০০৮ এর একটি সংবাদ এখানে হুবহু তুলে ধরা হলো –

জলঢাকা প্রতিনিধিঃ নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলার খুটামারা, কৈমারী, বালাগ্রাম, মীরগঞ্জ, শিমুলবাড়ী, কিশোরগঞ্জের পুটিমারী ও বড়ভিটার হিন্দুদের অর্থের লোভ দেখিয়ে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। মেগা ফেলোশিপ চার্চ ও ইভানজেলিক্যাল ফ্রেন্ডস চার্চসহ ৫ টি সংগঠন নগদ অর্থ, চাল, ডাল, শিক্ষা সহায়তা ও ঋণ প্রদানসহ আত্মনির্ভরশীল কার্যক্রমের আড়ালে ধর্মান্তরিত করার কাজ জোরে-শোরে চালাচ্ছে। এ লক্ষ্যে গড়ে তোলা হয়েছে এলাকাজুড়ে অফিস, উপাসনালয় ও শিশুদের জন্য স্কুল। শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তরালে স্কুলগুলোতে চালানো হয় বিভিন্ন সভা ও সমাবেশ। আর প্রোগ্রামের মাধ্যমে খৃষ্টান ধর্ম বুঝিয়ে ধর্মান্তরিত করার কাজ চলে। ওমেগা ফেলোশীপ চার্চ এনজিওর নামে গ্রামের অভাবী লোকদেরকে অর্থসহ বিভিন্ন সহায়তার কথা বলে তাদের তৈরি স্কুল ও অফিসগুলোতে নিয়ে তাদেরকে খৃষ্টান বানানো হচ্ছে। গত ১৬ এপ্রিল খুটামারা ইউনিয়নের ২০ জন মহিলা ও ৪ জন পুরুষ; পুটিমারী, কচুকাটা ও পঞ্চপুকুর ইউনিয়নের ১৮ জন; বড় ভিটা ও কৈমারী ইউনিয়নের ১০ জন মহিলা ও পুরুষের অভাবের সুযোগ কাজে লাগিয়ে ওমেগা ফেলোশীপ চার্চের কথা বলে দিনাজপুর, বীরগঞ্জ উপজেলার ৭ নং মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের জয়রামপুর গ্রামের মিশন স্কুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তার সেখানে গিয়ে খৃষ্টান বানানোর কথা জানতে পারার পর এলাকার মেম্বার ও চেয়ারম্যানকে অবহিত করেন। পরে ঐ ইউপির চেয়ারম্যান গোপাল চন্দ্র দেব শর্মা তাদেরকে উদ্ধার করে নিজ নিজ এলাকায় পাঠিয়ে দেন। বীরগঞ্জ থানার ওসি জানান, গত ১৬ এপ্রিল সংশ্লিষ্ট প্রতারকদের বিরুদ্ধে থানায় একটি জিডি করা হয়েছে। ভুক্তভোগীরা হলো – খুটামারা ইউনিয়নের খালিশা, খুটামারা গ্রামের টনে মামুদের স্ত্রী শাহী, টাটারি স্ত্রী ছারা, শাহারা, সুলতানের স্ত্রী আকলী, রবিউলের স্ত্রী নার্গিস, মৃত কলেজের স্ত্রী অহেদা, লবদ্দিনের স্ত্রী হাওয়া, বিশাদুর স্ত্রী হাওয়াতোন, বকশের

স্ত্রী মজিলা, ওসমানের স্ত্রী আসমা, রশিদুলের স্ত্রী ক্যান্টি, ভালের স্ত্রী এপাতন, মৃত টোলার স্ত্রী রহিমা বেগম ও পাদুরার ছেলে লবদ্দিন, মৃত জমালার ছেলে রমজান (ভালে)।

৫ হাজার টাকার বিনিময়ে ৫৫ মুসলমানকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা

নয়া দিগন্তের ২৭ মে ২০১০ ইং তারিখের একটি পেপার কাটিং এখানে তুলে ধরা হলোঃ

সাইফুল মাহমুদ, ময়মনসিংহ প্রতিনিধিঃ .... প্রত্যেককে পাঁচ হাজার টাকা করে ঋণ প্রদানের মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে ময়মনসিংহের ব্রক্ষপুত্র নদের তীরে ৫৫ মুসলমান নারী ও পুরুষকে খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করণের চেষ্টাকালে স্থানীয় জনতার সহায়তায় একজন বিদেশী ধর্মযাজকসহ তিন ধর্মযাজক ও তাদের নিয়োগপ্রাপ্ত দুই পালককে আটক করে পুলিশ। এ সময় ৫৫ মুসলমান নারী ও পুরুষকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত সবাই জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলার বাসিন্দা।

উদ্ধারকৃত নারী ও পুরুষেরা জানান, সরিষাবাড়ী উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের আবদুল বারেকের পুত্র রফিকুল, মাজারিয়া গ্রামের রফিক (পিতা – অজ্ঞাত) ও কাশেমের পুত্র রিপন এবং টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ি উপজেলার বাসনিয়োগী গ্রামের আসেক আলীর পুত্র শামসু, তাদের পাঁচ হাজার টাকা করে ঋণ দেওয়ার কথা বলে। দুই সপ্তাহ ধরে তাদের বলা হচ্ছে যে, ঋণ নেওয়ার জন্য সবাইকে ময়মনসিংহে যেতে হবে। এই আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল সকালে তাদের সরিষাবাড়ী উপজেলার পিংনা এলাকায় জড়ো করা হয়। সেখান থেকে তাদের একটি বাসযোগে ময়মনসিংহে নিয়ে আসা হয়। দুপুর নাগাদ বাসটি শহরের ব্রক্ষপুত্র নদের ব্রিজের কাছে পৌঁছে। এখানে একজন বিদেশীসহ তিন ব্যক্তি তাদের বাস থেকে নামিয়ে ব্রক্ষপুত্র নদের তীরে নিয়ে যান। এদের মধ্যে কয়েকজনকে নদের পানিতে গোসল করায় আর তাদের জিজ্ঞেস করে – তোমরা কি যীশুকে বিশ্বাস করো ? এমন প্রশ্ন শুনে অনেকেই জানতে চান, ঋণ নিতে হলে যীশুকে বিশ্বাস করতে হবে কেন ? তখন শামসু তাদেরকে চুপ থাকার কথা বলে ধমক দেয়। এমন পরিস্থিতিতে কেউ কেউ পিছু হটতে থাকে। এ সময় নদের তীরে একজন মওলানাকে দেখে ঋণ প্রত্যাশীরা জানতে চান, ঋণ নেওয়ার সাথে যীশুকে বিশ্বাস করার কোন কারণ আছে কি ? তখন হুজুর তাদের কথা শুনে বিষয়টি বুঝতে পারেন আর স্থানীয় লোকদের সাথে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন। এ সময় বেশ

কিছু লোক জড়ো হয়। তারা বিষয়টি পুলিশকে অবহিত করলে কোতোয়ালী থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ইউনাইটেড পেন্টিকেস্টল চার্চ অব বাংলাদেশের চেয়ারম্যান (প্রধান ধর্মযাজক) ফাদার রেভা সমর সাংমা ও ফাদার রেভা প্রদীপ সাংমাসহ তাদের নিয়োগপ্রাপ্ত দুই পালক শামসু ও রফিকুলকে আটক করে। এ সময় ৩৫ নারী ও ২০ পুরুষকে উদ্ধার করা হয়। তাদের সাথে ১৫ শিশুও রয়েছে। তারা সবাই মুসলিম দরিদ্র পরিবারের লোক।

এ দিকে ইউনাইটেড পেন্টি কেস্টল চার্চ অফ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান (প্রধান ধর্মযাজক) আমেরিকান নাগরিক ফাদার রেভা জেমস অরভিন নয়াদিগন্তকে জানান, আমরা কাউকে জোর করে ধর্মান্তরিত করি না। আমাদের কোন এনজিও নেই। আমরা কাউকে ঋণ প্রদানও করি না, আমরা তাদেরকে টাকা দেওয়ার কথাও বলিনি। তবে তিনি আগতদের কাছে জানতে চান, তারা যীশুকে বিশ্বাস করে কিনা, তার ব্যাপটিস্ট তরীকা কিনা। তখন জবাবে তারা বলেছেন, হ্যা, এ কথা বলার পরই তাদের গোসল করতে বলা হয়। কেন গোসল করতে বলা হলো ? এ প্রশ্নের কোন জবাব দেননি তিনি। তিনি বাংলায় আরো বলেন, আমার মন খুব খারাপ। ওরা অ্যাকশন নিবে, এসব আমার অপছন্দ।

খৃষ্টান মিশনারিরা ছলচাতুরি করে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ধর্মান্তরিত করার কাজ পুরোদমে করে যাচ্ছে।

খৃষ্টধর্ম প্রচারকদের কয়েকজন

(১) ড. উইলিয়াম কেরীঃ তিনি পি.এইচ.ডি. হোল্ডার। তিনি পশ্চিম বাংলায় কৃষি কাজ করেছেন। তার ভাষা ইংরেজি, তিনি এদেশে এসে বাংলা ভাষা শিখেন। তিনি দেখলেন, বাংলা ভাষা কোন সাহিত্যের মানে উত্তীর্ণ নয়। এটাকে ইংরেজি ভাষার সাথে মিলিয়ে একই ফর্মে একটি উন্নত ভাষা করা যায়। তিনি বহু বছর সাধনা করে এ বাংলাকে আধুনিক বাংলায় রূপান্তরিত করেন। বাংলা ভাষার উন্নতি সাধনে তার অবদান অনস্বীকার্য। তারপর তিনি কলকাতায় সুপিরিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজেই ঐ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হোন। তার উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষায় বাইবেল প্রচার। তখন বাংলা বর্ণের কোন ছাপাখানা ভারতবর্ষে ছিল না। তিনি ইংল্যান্ডে অর্ডার দিয়ে বাংলা বর্ণের ছাপামেশিন নিয়ে আসেন আর বাংলা ভাষায় বাইবেল ছাপান। তিনি সর্বপ্রথম ইংরেজি বাইবেল বাংলায় অনুবাদ করে ভারতবাসীর মধ্যে বিলি করেন। এমন ত্যাগ যদি বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে থাকতো, তাহলে আমাদের এতো দুর্দশায় পড়তে হতো না।

(২) মাদার তেরেসাঃ তিনি অবিবাহিতা ছিলেন। বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলায় তার প্রতিষ্ঠিত ৩০০ এতিমখানা রয়েছে। মাদার তেরেসার এক বড় টার্গেট ছিল ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে খৃষ্টান রাষ্ট্রে পরিণত করা।

এ ছাড়াও ড. টমাস, ফাদার টর্সবার্লার, টর্বেন্ডে পিটারসন, আলফ্রেড বরীন মণ্ডল, ড. অলসন – খৃষ্টান মিশনারির এ সকল নেতারা বছরের পর বছর ধরে বাংলার এ দুর্গম পাহাড়ের ভিতরে জীবন যাপন করে খৃষ্টধর্ম প্রচার করেন। আমরা ইতিহাসে সাহাবায়ে কেরামকে ধর্ম প্রচারের জন্য যেভাবে নিবেদিত পেয়েছি, এই খৃষ্টান নেতাদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের উৎসাহ তার চেয়ে খুব বেশী না হলেও কম ছিল না। আমাদের ঐতিহ্য আমরা ধরে রাখতে পারিনি। আমাদের ঐতিহ্য খৃষ্টানরা নিয়ে গেছে।

সেবা দিয়ে তাদের টার্গেট কি ?

পৃথিবীর পথে-ঘাটে পড়ে থাকা শিশুদের আর রাস্তার ধারে অবহেলিত জারজ সন্তানদের তারা পিকাপে করে নিয়ে যায় তাদের সেন্টারে। এ শিশুদের মেধাবীদেরকে তারা শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে ডাক্তার, পাইলট, সেনাবাহিনী ইত্যাদি বানায়। পৃথিবীর কোথাও যুদ্ধ বাঁধলে এদেরকে ব্যবহার করে। যেমন বর্তমানে আফগান, ইরাকে যুদ্ধরত বহু আমেরিকান ও ব্রিটিশ সৈন্য মারা পড়ছে কিন্তু এদের অনেকের জন্য চোখের পানি ফেলার মতো কোন আপনজন পাওয়া যায় না, কারণ এদের অধিকাংশই পথের ধারের অবহেলিত পরিচয়হীন জারজ সন্তান।

মিশনারি স্কুলের মাধ্যমে তাদের টার্গেট

খৃষ্টান মিশনারি প্রেরক সমিতির সভাপতি বলেন, খৃষ্টান মিশনারিদের বড় উদ্দেশ্য, যে সব ছাত্র আমাদের স্কুল কলেজ থেকে শিক্ষা সমাপন করে বের হচ্ছে, তাদের মন মস্তিষ্ক আমাদের ধাঁচে গড়ে তোলা। (আপনি ঢাকায় বা বাংলাদেশের প্রায় অঞ্চলে দেখবেন একটি স্কুলে ছাত্র দেওয়ার চেয়ে অভিভাবকরা বেশী খুশী হোন মিশন বা গির্জা স্কুলে ছেলে মেয়েদের ভর্তি করতে পেরে। কারণ ইংলিশ মিডিয়ামে পড়বে, ইংরেজি বলতে পারবে, স্মার্ট হবে, বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির সুযোগ পাবে, বহির্বিশ্বে উচ্চ শিক্ষার জন্য যেতে পারবে।) তিনি বলেছেন, কোন গির্জা স্কুলে যদি কোন মুসলমান ছেলে পড়ে তাহলে আমাদের লাভ। কারণ নিশ্চিতভাবে বলা যায়, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে। জুমআয় যাবে, ঈদের নামায পড়বে, মা-বাবা মারা গেলে জানাযায় যাবে কিন্তু মন-মেজাজ, চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা ইসলাম বিমুখ হবে। ইসলামের পক্ষে সে কথা বলবে না। বরং সে নিজের অজ্ঞাতে আমাদের মিশনারিগুলোর একজন বড় পৃষ্ঠপোষক হয়ে যাবে। বর্তমানে তাদের কথার প্রতিফলনের বহু নমুনা দেখা যাচ্ছে।

আপনি দেখবেন, পৃথিবীর যেখানে খৃষ্টান মিশনারিগুলোর স্কুল আছে, সেখানে গির্জাও আছে। গির্জা ছাড়া পৃথিবীতে কোথাও তাদের স্কুল কলেজ গড়ে উঠেনি, এমনকি লন্ডন ইউনিভার্সিটিও না। তার পাশে রয়েছে ভেস্টওয়ান খ্রিস্টিয়ান চার্চ। কিন্তু আমরা মুসলমানরা যদি যদি কোন স্কুল-কলেজ ইউনিভার্সিটির পাশে মসজিদ বানাতে চাই, তখন আমাদেরকে মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক আখ্যায়িত করা হয়। আপনি নটরডেমে যান কিংবা মোহাম্মদপুরে আসাদগেট মিশনারি স্কুলে, সাথেই গির্জা দেখতে পাবেন। তিনি আরো বলেছেন, আমাদের

স্কুলে যদি তাকে মেট্রিক বা ইন্টারমিডিয়েট পড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে সে আমাদের মিশনারির বিপক্ষে একটি টু শব্দও করবে না।

মিশনারি স্কুলের মাধ্যমে যা শিক্ষা দেওয়া হয়

দৈনিক নয়া দিগন্তের এক রিপোর্ট অনুযায়ী নীলফামারীতে আরো পাঁচটি সংগঠন রয়েছে, যারা ধর্মান্তরের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তারা তাদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোতে বাধ্যতামূলকভাবে যীশু খৃষ্টের বই, যীশু খৃষ্টের জীবনী ইত্যাদি পড়ায়। ছোটদেরকে "সিবগাতুল্লাহ" নামের একটি বই পড়ানো হয় যাতে বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠদান করে কচি বাচ্চাদের মগজ ধোলাই করা হয়। সেভেন ডে এডভেঞ্চারিস্টের একটি স্কুলে ছোট ছোট ছেলেদের বাধ্যতামূলকভাবে "ইটালি ডে জারি"র লেখা "আমার বাইবেলের বন্ধুগণ" পড়ানো হচ্ছে। জার্মানভিত্তিক ন্যাজরিয়ান মিশন সংগঠনটি বিনামূল্যে বই, খাতা, পোশাক এমনকি দুপুরের খাবারসহ বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে ধর্মান্তরিতকরণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

মিশনারি স্কুলের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবকের উক্তি

হালুয়াঘাটে সফরকালে এক ভাইয়ের সাথে কথা হচ্ছিলো। তিনি বলেন, আমার ছেলে মিশনারি স্কুলে বাইবেলও পড়ে। কথাটা খুব গর্বের সাথে বলছিলেন।

সমিতির মাধ্যমে প্রচার

খৃষ্টান মিশনারিগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামে-গঞ্জে পুরুষ-মহিলাদের নিয়ে সমিতি গড়ে তুলেছে। আর সেই সমিতির সদস্যদের পড়ানো হচ্ছে বাইবেল, বিভিন্ন সিডি প্রদর্শনীর মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে যীশুখৃষ্টের জীবনীমূলক চলচ্চিত্র। তাদেরকে পড়ানো হয় ইনজিল শরীফ, মানে বাইবেল। লুকের লেখা "হযরত ঈসা মসীহ" আর "মুসলমান ও হিন্দুরা ১০০ ভাগ জাহান্নামী আর খৃষ্টানরা ১০০ ভাগ জান্নাতি" সহ আরো কতো বিচিত্র বই। রাতের আঁধারে শিশু ও মহিলাদের দেখানো হয় বিভিন্ন সিডি।

“আগাবে” নামক একটি সমিতিতে সপ্তাহে ২ টাকা জমা নেওয়া হয় এ বলে যে, যখন এক হাজার টাকা জমা হবে, তখন তাদেরকে দশ হাজার টাকা দেওয়া হবে। এ রকম লোভ দেখিয়ে তারা দরিদ্রদের হাত করছে। একজনকে ১৮ হাজার টাকার চাকরি দেওয়া হবে বলে খৃষ্টান বানিয়েছে। ইভানজেলিক্যাল ফ্রেন্ডস চার্চ ও খৃষ্টান লাইফ অফ বাংলাদেশ (সি.এল.বি.) ‘র ইউনিয়ন ইনচার্জ নতুন রায়ের ভাষ্যমতে, ১২ ই জুন ৪৫ জন মুসলমান ও ১৩ ই জুন ৫৬ জন হিন্দুকে শিশাতলী গির্জায় নিয়ে খৃষ্টান বানানো হয়েছে।

নীলফামারী জেলায় খৃষ্টধর্ম প্রচার

নীলফামারী জেলা প্রশাসন কার্যালয় থেকে ৩০০ গজ দূরে উকিলপাড়ায় অবস্থিত ইউনাইটেড পেন্টিকস্টাল চার্চ অফ বাংলাদেশ নামে একটি সংগঠন নিরবচ্ছিন্নভাবে ধর্মান্তরকরণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সংগঠনটির আঞ্চলিক সমন্বয়ক প্রফুল্ল কুমারের দেওয়া তথ্যমতে শুধুমাত্র গত এক বছরে এই জেলাতেই ৫৩৬ জন হিন্দু ও ৪৫ জন মুসলমানকে ধর্মান্তরিত করে খৃষ্টান বানানো হয়েছে। কেউ যদি ধর্মান্তরিত হওয়ার পর ঢাকার বাইবেল বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর পড়ে তার চাকরি ১০০ ভাগ নিশ্চিত।

নেত্রকোনা জেলায় ধর্মপ্রচার

নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুরসহ বিভিন্ন এলাকার গারোদের খৃষ্টান বানাতে সক্ষম হয়েছে। নজরুল ইসলাম নামক প্রত্যক্ষদর্শীর দেওয়া তথ্যমতে নেত্রকোনা জেলায় “মৌ” নামক স্থানে যাওয়ার পথে দুটো মুসলমান ইউনিয়ন খৃষ্টান ইউনিয়নে পরিণত হয়েছে। অথচ সেখানে ৫ টি মাদরাসা রয়েছে।

মি. বুশের একটি ভাষণ

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাক আক্রমণের পূর্বে এক ভাষণ দেন যা ১৪ টি ভাষায় প্রচারিত হয়েছিলো। তিনি বলেছিলেন – ঈশ্বর মার্কিন সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন ভালোকে সম্প্রসারণ এবং মন্দকে প্রতিহত করতে। তাই এই সরকার বাইবেলে প্রদত্ত নীতি অনুযায়ী মার্কিন জাতিকে রক্ষা এবং সারা বিশ্ববাসীকে গোলামীর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য যুদ্ধে সৈন্য পাঠাচ্ছে। তিনি বলেন – মানুষকে মুক্ত করার জন্য আসলে খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে হবে। মার্কিনীদের ছত্রছায়ায় খৃষ্টধর্ম প্রচার খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। যাদের বাপ নেই, মা নেই, আর যারা বিধবা, স্বামী নেই, তাদেরকে খৃষ্টান বানানোর জন্য পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।

চট্টগ্রামে খৃষ্টানদের দাওয়াতি কাজ

দৈনিক ইনকিলাবের এক সাংবাদিক সাদেক হুসেন তার একটি গবেষণামূলক প্রতিবেদনে বলেছেন, রাঙ্গামাটি থেকে দুই দিনের দূরত্বে ভারতের সীমানার কাছে একটি ইউনয়ন আছে "সাজেক"। এ এলাকায় ২০ হাজার মানুষ আছে যারা ইংরেজিতে কথা বলে। গিটার বাজিয়ে ইংরেজি গান গায় আর ছেলে-মেয়েরা জিন্স প্যান্ট পড়ে। ইউরোপীয় স্টাইলে তাদের জীবনধারা।

দৈনিক ইনকিলাবের প্রকাশিত একটি সূত্রমতে কারিতাস, ওয়ার্ল্ড ভিশন প্রভৃতি এনজিও দরিদ্র ও অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে সেখানকার বিপুল সংখ্যক মানুষকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জেলায় বসবাসকারী উপজাতিরা খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে এবং সেখানে রয়েছে তাদের সুদূরপ্রসারী কর্মকাণ্ড। আর এ কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের কোন ঘটনা ঘটলেই পাড়া-পড়শি জানার আগেই তা পৌঁছে যায় বিশ্বব্যাপী। ঘটনাস্থলে থানার পুলিশ পৌঁছার আগেই ওয়াশিংটন, লন্ডন, টোকিও, ভ্যাটিকান প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বিবৃতি আসতে থাকে।

জুমল্যান্ড পরিকল্পনা

একাধিক আন্তর্জাতিক খৃষ্টানসংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি আলাদা রাষ্ট্র করার চক্রান্ত চালাচ্ছে। মুসলিম রাজ্যের বুকে জুমল্যান্ড নামে একটি খৃষ্টানরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে। যেমনটি ইন্দোনেশিয়ায় "পূর্ব তিমুর" নামে প্রতিষ্ঠা করেছে। বাংলাদেশের হৃৎপিণ্ডতুল্য খনিজ সম্পদের অপার সম্ভাবনায়ময় এক দশমাংশ অঞ্চল তথা পার্বত্য এলাকাকে ঘিরে তাদের এ নয়া রাষ্ট্র তৈরির পরিকল্পনা। ৭ মে ২০০৬ ইং তারিখে দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, সন্তু লারমার পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে স্বাধীন জুমল্যান্ডের পরিকল্পনা থাকলেও মিশনারিদের টার্গেট ভিন্ন। তাদের লক্ষ্য দক্ষিণ এশিয়ায় একটি খৃষ্টান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটানো।

অবশ্য প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকগণ মনে করেন, ইহুদি-খৃষ্টান বিশ্বের লক্ষ্য শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়, এর সাথে ভারতের সেভেন সিস্টার্স রাজ্যগুলোকে একত্র করে একটি বৃহৎ খৃষ্টরাষ্ট্রের জন্ম দিবে। সে কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো ভারতের সেভেন সিস্টার্স রাজ্যগুলোতেও বিশেষ করে ঐ সব অঞ্চলের উপজাতিদের মাঝে একই ধরনের মিশনারিগোষ্ঠীর জোরালো কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাদের মতে, এদের লক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ এ অঞ্চলে খৃষ্টানরাষ্ট্র সৃষ্টির মাধ্যমে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ শক্তিগুলোর প্রতিরক্ষাবলয় সৃষ্টি করা। ভূ-কৌশলগত দিক থেকে বিষয়টি তাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের পার্বত্য এলাকা তথা মিজোরাম, অরুনাচল, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, মনিপুরে এবং বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় দেশীয় ও ইউরোপীয় খৃষ্টান মিশনারিদের দ্বিমুখী তৎপরতায় ধর্মান্তরিত করার কাজ পুরোদমে চলছে। তাদের পরিকল্পনা হলো, যখন এ দুই পার্বত্য এলাকার অধিকাংশ মানুষ খৃষ্টান হয়ে যাবে তখন সন্তু লারমা গং গণভোটের দাবী তুলবে। এদিকে ইহুদি-খৃষ্টানদের ক্রীড়নক জাতিসংঘ গণভোটের পক্ষে চাপ সৃষ্টি করবে। এভাবে প্রতিষ্ঠা করবে তাদের স্বপ্নের স্বাধীন খৃষ্টরাষ্ট্র।

আমরা মুসলমানরা যদি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি না পাল্টাই, তাদের কাছে ইসলামের আমানত না পৌঁছে দেই, তাহলে আমাদেরও ভোগ করতে হবে পূর্ব তিমুর ও দক্ষিণ সুদানের পরিণতি।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মাধ্যমে ধর্মান্তরকরণ

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মাধ্যমে গরীব অসহায়দের চিকিৎসা সেবার নামে তাদের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে খৃষ্টান বানানোর গভীর ষড়যন্ত্রের নীলনকশা তারা বাস্তবায়ন করে চলেছে। মিশনারিদের এই নিরন্তর সাধনায় তারা আদৌ ব্যর্থ হচ্ছে না।

খৃষ্টান বানানোর কৌশল

কৌশল ১ – যশোরে ফাতেমা নামক একটি হাসপাতাল আছে। প্রতিদিন সে হাসপাতালে প্রায় ছয়শত মুসলমান চিকিৎসা নেওয়ার জন্য যায়। আর এ সুযোগে তারা ধর্মান্তরে আকৃষ্ট করার চাতুরীপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করে। জনৈক রোগীর ঘটনা, সে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে গেলো। কর্তব্যরত নার্স তাকে তাকে একটি ঔষধের পোটলা দিয়ে বললো, এটা আল্লাহ'র নাম নিয়ে খেয়ো। সরল মহিলা সেবিকার পরামর্শ অনুসারে ঔষধ সেবন করলো বটে, কিন্তু রোগ সারলো না। পরদিন আবার গেলে তাকে আরেকটি ঔষধের পোটলা দিয়ে বললো, যীশুর নামে খেয়ে দেখো সারে কিনা। এবার ঔষধ সেবনে তার রোগ সারলো। (মূলত দ্বিতীয় পর্যায়ে সঠিক ঔষধ দিয়েছিলো) এভাবে প্রহসনের মাধ্যমে দেশের সরলপ্রাণ আত্মভোলা মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছে মিশনারিরা।

কৌশল ২ – খৃষ্টান মিশনারিগুলোর অনুদাননির্ভর এনজিওদের দ্বারা দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হাজার হাজার প্রাথমিক স্কুল। নিরক্ষরতা দূরীকরণ শ্লোগানের আড়ালে সেখানে কোমলমতি শিশুদের মনে খৃষ্টধর্মের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির নিরন্তর প্রয়াস চালানো হচ্ছে। যেমন – খৃষ্টান মিশনারিগুলোর অনুদাননির্ভর একটি এনজিও দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্কুলে জনৈক শিক্ষিকা ছাত্রদের বললেন, বাড়িতে তোমাদের আব্বু-আম্মু তোমাদের বেশী ভালোবাসেন, না তোমাদের বাড়ির সেবকদের (কাজের লোকদের)। উত্তরে কোমলমতি শিশুরা বললো – বাবা-মা আমাদের বেশী ভালোবাসেন। তখন শিক্ষিকা বললেন – তোমাদের বাবা-মা তোমাদের স্নেহ করেন এজন্য যে, তোমরা তাদের সন্তান। তেমনই খৃস্টধর্মের প্রবর্তক যীশু হলেন আল্লাহ'র পুত্র, আর মুসলমান ধর্মের প্রবর্তক মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হলেন আল্লাহ'র বান্দা ও দাস। এখন বলো, পুত্র হিসেবে আল্লাহ যীশুকে বেশী ভালোবাসেন, না মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'কে ?

কৌশল ৩ – খৃষ্টানরা পরিকল্পিতভাবে খৃষ্টধর্মের বর্তমান বিকৃতরূপকে জাগতিক উন্নতি, পরকালের মুক্তির একমাত্র সহজ উপায় হিসেবে উপস্থাপন করছে। তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষের দলীল হিসেবে ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতসমূহকে পেশ করছে। এতে বিভ্রান্ত হচ্ছে আত্মভোলা সহজ-সরল জনগোষ্ঠী, ধর্মান্তরিত হচ্ছে অনেক মানুষ। যাদের ধর্মান্তর করার জন্য টার্গেট করা হয়, তাদের ধারণা দেওয়া হয় যে, পূর্বের নবীদের উপর ঈমান রাখাও ইসলামের মৌলিক বিধান। এক্ষেত্রে ঈমান হিসেবে ঈমানে মুসাসসালের অংশবিশেষ "নবীদের উপর ঈমান আনয়ন" এর আবশ্যকতার প্রসঙ্গটি উপস্থাপন করা হয় অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে। এ ধরেনর প্রচারণার শিকার দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ থানার আমীর হামযা সম্পর্কে জানা যায়, সে নিজেলে ঈসায়ী মুসলমান হিসেবে দাবী করে। তার বক্তব্যের স্বপক্ষে "ঈমানে মুফাসসাল" কালেমার বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করে যুক্তি দেখায় যে, এতে পূর্ববর্তী নবীদের উপর ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে এবং তা আবশ্যক, সে নিরিখে সে ঈসায়ী মুসলমান। এ সব ঘটনা বিশ্লেষণে এ বিষয়টি প্রকাশ পায় যে, ধর্মান্তর ঘটানোর জন্য যে কৌশলেরই প্রয়োজন দেখা দিক, সুচতুরভাবে তা প্রয়োগে তার সদা তৎপর থাকে।

কৌশল ৪ – মুসলিমুদ্দিন সানোয়ার নামে এক যুবককে (যিনি খৃষ্টানদের প্রতারণার শিকার হয়েছিলেন) জিজ্ঞাসা করলাম, কিভাবে তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছিলেন। সানোয়ার বললেন, আমি দুইবার মিশনারির প্রতারণার শিকারে পরিণত হয়েছিলাম। প্রথমবার শিকার হয়েছিলাম ১৯৮৭ সালে। বই পাঠে আমার প্রচণ্ড লোভ ছিল। একদিন একটি বইয়ে "পোস্ট বক্স নং" সংযুক্ত একটি ঠিকানা পেলাম। বইটি ছিল খৃষ্টান মিশনারির প্রকাশিত। আগে শুনেছি, খৃষ্টানদের চিঠি-পত্র লিখলে তারা প্রচুর বই পাঠায়। তাই কোন কিছু চিন্তা না করেই ঠিকানা অনুযায়ী পত্র লিখলাম। এর কিছুদিন পরই ডাক মারফত আমার ঠিকানায় বই আসলো, সাথে একটি প্রশ্নপত্র। প্রশ্নপত্রটি দেখে বুঝলাম, বইগুলো পড়ে উত্তর দিতে হবে। হাতে সময় মাত্র সাত দিন। অনেক খুঁজাখুঁজির পর উত্তরগুলো লিখে পাঠালাম। পরবর্তীতে তারা আমার কাছে ডাকে আরো কিছু বই ও প্রশ্নপত্র পাঠালো। তখন আমি এইচ.এস.সি. ১ম বর্ষের ছাত্র। উত্তর লিখে নির্ধারিত বক্স নাম্বারে পাঠানোর পর তারা আবার এক সেট বই, প্রশ্নপত্র, নাম্বার ও সনদপত্র পাঠালো।

তৃতীয়বারের প্রশ্নপত্রের একটি প্রশ্ন দেখে একটু বিব্রতবোধ করলাম। প্রশ্নটি ছিল এরূপ – আপনি কি যীশুকে রিযিকদাতা বলে বিশ্বাস করেন ? আমি জানতাম, এ প্রশ্নের উত্তরে যদি হ্যা বলি, তাহলে আরো বই আসবে, অন্যথায় বই পাঠানোর এ ধারা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু ঈমানের দাবীকেই আমি অগ্রাধিকার দিয়ে প্রশ্নের উত্তরে "না" লিখে পাঠালাম।

কৌশল ৫ – সেই সানোয়ার দ্বিতীয়বার মিশনারির শিকার হলেন। সানোয়ার বলেন, আমি চাকরি পাওয়ার জন্য একদিন ঢাকায় ১০৫/১৬ মনিপুরী পাড়ায় সিএলবি অফিসের ঠিকানায় উপস্থিত হলাম। পরিচয়পর্বের পর সেখানের এক কর্মকর্তা আমাকে খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে বেশ ধারণা দিতে লাগলো এবং বিভিন্ন ছবি দেখিয়ে তার উক্তিগুলোর যুক্তি দিতে লাগলো। আমি নীরবে তার কথার সায় দিচ্ছিলাম। তার কথার সারমর্ম ছিল, যীশুই এ পৃথিবীর একমাত্র অভিভাবক। যীশুকে ছাড়া আল্লাহ'কে পাওয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়। আমার ইতিবাচক অবস্থাদৃষ্টে "ধর্মান্তর করা যাবে" মর্মে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো। সেদিন অফিস থেকে বের হওয়ার সময় আমাকে ২১/২২ মার্চ ১৯৯৯ ইং সালে ট্রেনিংয়ে যোগদানের জরুরী আহবান জানিয়ে বিদায় নিলো। সম্ভবত ৯ই অক্টোবর ১৯৯৯ ইং সালের ঘটনা – একজন ফাদার আমাকে খৃস্টধর্মের বড়ত্ব সম্পর্কে দীর্ঘক্ষণ বুঝান। এরপর ধ্যানের আসনে বসিয়ে একটি বই থেকে কিছু পড়ালো, তখন আমার চোখ বন্ধ ছিলো। পড়া শেষে আমাকে বলা হলো, আপনি খৃষ্টান হয়ে গেছেন। এরপর খৃষ্টধর্মের স্বার্থকতা ও ইসলামধর্মের অসারতা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলো। এক পর্যায়ে আমাকে বললো – মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যক্তি হিসেবে একজন সাধারণ মানুষ, ইসলামধর্মে তার কৃতিত্ব নেই। একমাত্র যীশুই সমস্ত কিছুর অধিকারী। যীশুর জন্ম না হলে এ পৃথিবীর জন্ম হতো না।

কৌশল ৬ – মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়ার একটি বড় কৌশল হলো, মিশনারিতে ধর্মান্তরিত হলেও নাম রাখে মুসলমানদের, যাতে মুসলমানরা বুঝতে না পারে। যেমন, যশোর জেলায় ফাতেমা হাসপাতাল নামে একটি মিশনারি হাসপাতাল আছে। হাসপাতালের প্রবেশমুখে শ্বেতপাথরে খোদিত সুন্দর একটি সিনারী আঁকা, এতে মাদার তেরেসার সদলবলে একটি সাঁকো পার হওয়ার দৃশ্য। ছবির নিচে সুন্দর করে লেখা – যীশু পীড়িত মানুষকে সেবাদানের জন্য এভাবে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। ছবিটি হাসপাতালের প্রবেশ পথের সামনের দেওয়ালে এমনভাবে সাঁটানো যে, যে কোন দর্শনার্থী ও সেবাগ্রহীতা লোকের নজর কাড়ে। হাসপাতালের গেটম্যানের নাম মুহাম্মাদ সৈয়দ, মূলত এই লোকটি খৃষ্টান। তদ্রূপ হাসপাতালের এম. ডি. ও প্রধান ডাক্তারসহ প্রায় সবাই খৃষ্টান হলেও মুসলিম নাম ধারণ করেছে। যেমন, এম. ডি.র নাম মুহাম্মাদ বোখারী।

এই হাসপাতালের পিছনে একটি গির্জা আছে। গির্জা ও হাসপাতালের মাঝামাঝি একটি পার্ক আছে। এ পার্কে টিলার উপর কৃত্রিমভাবে নির্মিত বিশাল আকারের একটি নারীমূর্তি। এর সামনে কয়েকটি নারীমূর্তির হাঁটু গেঁড়ে প্রণাম করার দৃশ্য। কয়েকটি ভেড়া হা করে চেয়ে আছে বিশাল নারী মূর্তিটির দিকে। এর মধ্যে একটি ভেড়া অলস ঝিমুচ্ছে। রোগী ও দর্শনার্থীরা

ঘুরে ঘুরে পার্কে স্থাপিত মূর্তিগুলোর লীলা উপভোগ করছে। রোগীদের একঘেয়েমী দূর ও চিত্ত-বিনোদনের জন্য এ ব্যবস্থা। পার্কে স্থাপিত মূর্তিগুলো দেখলে মনে হয় – এগুলো গির্জার মহিমা ফেরি করে বেড়ানোর জন্য রাখা হয়েছে। সে পার্কে মিশনারির নিযুক্ত লোক দর্শনার্থী ও রোগীদের কাছে মূর্তিগুলোর অবস্থা বিশ্লেষণ করে মেরীর মহিমা প্রচার করে। যেমন, দর্শনার্থীদের বা রোগীদের বুঝায় যে, টিলার বড় নারী মূর্তিটি হলো মেরী, যাকে মরিয়ম বলা হয়। আর প্রণামরত ছোট ছোট নারী মূর্তিগুলো হলো স্বর্গীয় দূত, যাদেরকে আপনারা ফেরেশতা বলেন। অর্থাৎ, মেরী কোন একসময় পাহাড়ি অঞ্চল দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন, তখন স্বর্গীয় দূতেরা তাকে দেখে প্রণাম করছে আর ভেড়াগুলো ঘাস খাওয়া বিরতি দিয়ে মেরীকে দেখছে। একটি ভেড়া বেখেয়ালে ঝিমুচ্ছে। স্থানীয় একজন আলিম জানান, রোগীদের পার্কে ঘুরানোর সময় গির্জার নিযুক্ত লোকেরা চাতুর্যের সাথে মেরীর মূর্তি ও গির্জার প্রতি ভক্তিমূলক ইঙ্গিত-ইশারা করে রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনার প্রসঙ্গ তোলে। আর হাসপাতালের দেওয়ালে সাঁটানো যীশুর ছবি, সাঁকো পার হওয়া সংবলিত আর্ট, গ্রামে গ্রামে ঘুরে যীশুর রোগীসেবা ও সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের রোগীর বেডের আশেপাশে খৃষ্টধর্মের বিভিন্ন বই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা হয়, যেন অবসর সময়ে রোগী নিজ থেকে বই হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করে। এভাবে সেখানে লোকজনকে ধর্মান্তরে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

মিশনারি কর্মীদের নির্লজ্জ কাহিনী

১৭-৮-৯৮ ইং তারিখে দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত রিপোর্টের অংশবিশেষ উল্লেখ করা হলোঃ

পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ থানার লক্ষ্মীরাজ গ্রামে দুইজন মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগে নারী উন্নয়ন সংস্থা প্রধান আতাউর রহমানকে পুলিশ গ্রেফতার করে। এ সময় ধর্ষিতারা জানান, গত ১লা আগস্ট প্রশিক্ষণের নামে ৯ জন মহিলাকে গ্রামের অফিস লক্ষ্মীরহাটে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে রাত যাপনে তাদেরকে বাধ্য করা হয়। রাতে খাওয়া দাওয়া শেষ হলে একটি কক্ষে তাদেরকে আটকে রাখা হয়। রাত আনুমানিক ১ টার দিকে প্রতিষ্ঠানের পিয়ন অনুখুল ও মহিলা কর্মচারী লায়লা খাতুন তাদেরকে জানায়, বড় সাহেব তোমাদের সাক্ষাৎকার নিবেন। তারপর একজন একজন করে পাশের ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে অবস্থানরত কয়েকজন লোক তাদেরকে রাতভর ধর্ষণ করে। ধর্ষণের পর থেকে পরদিন দুপুর ২টা পর্যন্ত ঐ ঘরে তাদেরকে আটকে রাখা হয়। ছেড়ে দেওয়ার আগে ঘটনাটি ফাঁস না করার জন্য তাদেরকে বিভিন্ন ভয়-ভীতি দেখানো হয়। পড়ে মহিলারা গ্রামে ফিরে নিজ নিজ অভিভাবককে জানালে এবং লোকমুখে ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে বিক্ষুব্ধ জনতা মিছিল বের করে। সেদিন থেকে এ এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

তথ্যপঞ্জি – দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক নয়াদিগন্ত, দৈনিক করতোয়া, ধর্মান্তরের খোলা হাওয়া, দেশ জগত।

এ ধরনের বহু ঘটনা গ্রামবাংলায় ঘটছে। কোনটা পত্রিকার খবর হয়, আবার কোনটা হয় না। অনেকেই লোকলজ্জার ভয়ে এনজিওদের বর্বরতা চাপা দিয়ে রাখে।

দাওয়াতি কার্যক্রম

আজ খৃষ্টান মিশনারিরা নিষ্ঠার সাথে তাদের দাওয়াতি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের আহবায়িত মানুষ হলো মুসলমান। তাই মুসলমানদের কাছে তাদের মিথ্যা দাওয়াত পৌঁছানোর চেষ্টা করছে। তাই তো দেখা যায় গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে, অফিস-আদালতে তাদের দাওয়াত চলছে। এমনকি আমাদের মসজিদেও তাদের দাওয়াত চলছে।

আজ থেকে বছর খানেক আগের কথা। আমি তখন মধ্য বাড্ডায় নৈশ মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করি। একদিন সকালে আমার এক ছাত্র এসে বললো, কে যেন একটি ইনজিল শরীফ রেখে গেছে। এভাবেই চলছে তাদের দাওয়াতি কার্যক্রম।

স্কুল-কলেজে তাদের দাওয়াত চলছে হ্যান্ডবিল ও বই-পত্রের মাধ্যমে। সেমিনারের মাধ্যমে বুঝানো হচ্ছে, ঈসায়ী ধর্মই হচ্ছে গুনাহ থেকে মুক্তির একমাত্র সহজ পথ। কিন্তু আমরা কয়জন অমুসলিমকে দাওয়াত দেই ? কয়জন হিন্দুকে ইসলামের কথা বলি ? কয়জন খৃষ্টানকে আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিচয় বলি ? খৃষ্টানরা তো জীবন বাজী রেখে আমেরিকা, ইতালি ও লন্ডন থেকে বাংলাদেশে আসে ধর্মপ্রচার করতে। তারা চলে যাওয়ার জন্য আসে না, এদেশেই তাদের অন্তিম সমাধি হয়। তার ভুরি ভুরি ঘটনা রয়েছে। এখানে একটিমাত্র উল্লেখ করছি।

ফাদার হুমরিক নামক এক খৃষ্টধর্ম প্রচারক বাংলাদেশের ময়মনসিংহে দীর্ঘ ৪০ বছর যাবত কর্মরত। তার প্রচেষ্টায় ৩০ হাজার গারো উপজাতি খৃষ্টান হয়েছে। আর আমি আপনি কয়জন অমুসলিমকে মুসলমান বানাতে পেরেছি ? এ দেশে তো কোন মুসলমান ছিল না। আমরা মুসলমান হয়েছি কিভাবে ? আমাদের আকাবিরগণ এদেশে এসেছেন ইসলাম প্রচার করার জন্য, তারা প্রচার করে চলে যাননি। দেখুন, সিলেটে শাহজালাল ইয়ামানী, খান জাহান আলী, কারামত আলী জৈনপুরী প্রমুখ বুযুর্গানে দ্বীন আমৃত্যু এ দেশে ইসলাম প্রচারের কাজ আঞ্জাম দিয়ে গেছেন।

সূত্রঃ

বাংলাদেশে খৃষ্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা ও আমাদের করণীয় (লেখক - মুফতী যুবায়ের আহমদ)

পয়গামে সুন্নত ১৪৩১-৩২ হিজরি,

মুসলিম বিশ্বে ইহুদী খৃষ্টানদের মরণ ছোবল (লেখক- মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী)